দাম : বারো টাকা

স্বস্তিকা

পাকিস্তানি আইনে দখল করা সম্পত্তি আদৌ ফেরত পাবে হিন্দুরা ?
— পৃঃ ৩৫

রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে পি এইচ ডি নিয়ে ছেলেখেলা বন্ধ হোক
— পৃঃ ১৩

৭১ বর্ষ, ৪৭ সংখ্যা।। ৫ আগস্ট ২০১৯।। ১৯ শ্রাবণ - ১৪২৬।। যুগাব্দ ৫১২১।। website : www.eswastika.com

মহাকাশ গবেষণায় ভারতের ঐতিহাসিক পদক্ষেপ

চন্দ্রযান -২

- প্রকল্পে মোট খরচ ৯৭৮ কোটি টাকা
- মহাকাশযানের ওজন ৩.৮ টন
- পে লোড : ১৪ (ভারতের ১৩, নাসার ১)
- পৃথিবীর চারপাশে পরিক্রমা ১৬ দিন
- চাঁদে পৌঁছানোর সময় ৫ দিন
- চাঁদের মাটিতে অবস্থান ১৪ দিন



স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭১ বর্ষ ৪৭ সংখ্যা, ১৯ শ্রাবণ, ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

৫ আগস্ট - ২০১৯, যুগাব্দ - ৫১২১,

Website : www.eswastika.com



সম্পাদক : রন্তিদেব সেনগুপ্ত

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১

অফিস হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৬

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১২ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৫০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2019-2021

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

ওঁ স্বস্তিক প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ▯ ৫

ঊনপঞ্চাশী 'বুদ্ধিজীবী' ও তাঁদের স্বরূপ ▯ বিশ্বামিত্র ▯ ৬

খোলাচিঠি : তৃণমূল তবে উঠে গেল! ▯ সুন্দর মৌলিক ▯ ৭

বিশ্ব অর্থনীতিতে নিয়ামক হওয়ার সুযোগ রয়েছে ▯ অরবিন্দ পানাগড়িয়া ▯ ৮

রাজ্যপালই রাজ্যের প্রকৃত শাসনকর্তা ▯ ড. নির্মলেন্দু বিকাশ রক্ষিত ▯ ১১

রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে পি এইচ ডি নিয়ে ছেলেখেলা বন্ধ হোক ▯ শুভ্র সান্যাল ▯ ১৩

'নিঃস্ব' মমতার 'ফিরিয়ে দাও' আকুতি নিজস্ব ভুলেরই স্বীকৃতি ▯ সুজিত রায় ▯ ১৫

পুরসভার ভোটকে পাখির চোখ করে ঝাঁপাতে হবে এখনই ▯ পার্থসারথি গুহ ▯ ১৬

পশ্চিমবঙ্গের শিল্পক্ষেত্রে দূষণ সংক্রান্ত অডিট রিপোর্ট নিশ্চিতভাবে এক অশনি সংকেত ▯ ১৭

কবিগুরুর অন্তিমযাত্রা জাতীয় গ্লানির দিন হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে ▯ বেদ মোহন ঘোষ ▯ ১৮

মহাকাশ গবেষণায় ভারতের ঐতিহাসিক পদক্ষেপ ▯ অরিন্দম মল্লিক ▯ ২৩

ভারতের একটি গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষামূলক অভিযান চন্দ্রযান - ২ ▯ ড. নিশীথ দাস ▯ ২৪

মহাবিশ্বে ইতিহাস গড়ার লক্ষ্যে ভারতের চন্দ্রযান-২ ▯ শর্মিষ্ঠা বসু ▯ ২৫

চন্দ্রযান -২ : চন্দ্রলোকে পাড়ি দিল ভারত, কতখানি লাভ হলো আমাদের? ▯ অনিন্দ্য বন্দ্যোপাধ্যায় ▯ ২৬

আনন্দ নৃত্যে বিভোর চিরসত্য সনাতন নটরাজ ▯ অমিত ঘোষ দস্তিদার ▯ ৩১

লোকচক্ষুর অগোচরে কোঁচ মন্দির ▯ কৌশিক রায় ▯ ৩৩

পাকিস্তানি আইনে দখল করা সম্পত্তি আদৌ ফেরত পাবে হিন্দুরা? ▯ ৩৫

প্রিয়ার অপ্রিয় সত্য কথন বাংলাদেশের মুখোশ খুলে দিয়েছে ▯ শিতাংশু গুহ ▯ ৩৮

জি এস এল ভি মার্ক-৩ এম-১ উৎক্ষেপণ যানের সাহায্যে চন্দ্রযান -২ মহাকাশ যানের সফল উৎক্ষেপন ▯ ৪০

ব্যাঙ্ক বেসরকারিকরণ সরকারের অ্যাজেন্ডা নয় ▯ সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় ▯ ৪৩

মমতা ব্যানার্জি সেই যাত্রাপালার হিন্দুমান ▯ গুরুপদ বিশ্বাস ▯ ৪৫

নিয়মিত বিভাগ

উবাচ : ১০ ▯ **চিঠিপত্র** : ১৯-২০ ▯ **অঙ্গনা** : ২১ ▯ **সুস্বাস্থ্য**: ২২ ▯ **খেলা** : ৪১ ▯ **চিত্রকথা** : ৪২ ▯ **নবাঙ্কুর** : ৪৬-৪৭ ▯ **সংবাদ প্রতিবেদন** : ৪৮▯ **স্মরণে** : ৪৯ ▯ **সাপ্তাহিক রাশিফল** : ৫০

প্রকাশিত হবে ১২ আগস্ট ২০১৯

স্বস্তিকা

প্রকাশিত হবে ১২ আগস্ট ২০১৯

আগামী সংখ্যা পনেরো আগস্ট বিশেষ সংখ্যা

দেশভাগ এবং পশ্চিমবঙ্গের জন্ম

পশ্চিমবঙ্গের জন্মের ইতিহাস কতজন বাঙ্গালি জানেন? বস্তুত, দেশভাগের সময় বাঙ্গলায় যে মর্মন্তুদ পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল, তার যথার্থ ইতিহাস আজও লেখা হয়নি। খুব কম মানুষই জানেন, শরৎচন্দ্র বসু এবং কিরণশংকর রায় স্বাধীন অখণ্ড বাঙ্গলা দাবি করে হিন্দু বাঙ্গালিকে সমূলে উপড়ে ফেলার ব্যবস্থা করেছিলেন। কিংবা, দেশভাগের পর যেসব মুসলমান পূর্ব পাকিস্তানে চলে গিয়েছিলেন, নেহরু-লিয়াকত চুক্তি করে আবার তাদের ফিরে আসার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। ১৫ আগস্ট ১৯৪৭ ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তির দিন। সেইসঙ্গে দেশভাগেরও দিন। স্বস্তিকার আগামী সংখ্যার বিষয়, দেশভাগ এবং পশ্চিমবঙ্গের জন্ম। লিখবেন— রন্তিদেব সেনগুপ্ত, সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, কল্যাণ চক্রবর্তী প্রমুখ।

সত্বর কপি বুক করুন।। দাম : বারো টাকা মাত্র

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,

৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name : **OMSWASTIK PRAKASHAN PVT. LTD.**

A/C. No. : **917020084983100**

IFSC Code : **UTIB0000005**

Bank Name :

AXIS Bank Ltd.

Branch : **Shakespeare Sarani Kolkata**

সানরাইজ®

সর্ষে পাউডার



SUNRISE® PURE

স্বাস্থ্য-সম্মত, ঝাঁঝালো - খেতে বড্ড ভালো।

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

এই সাফল্য ঐতিহাসিক

১৯৪৭-এর আগস্ট মাসে দুইটি দেশ ব্রিটিশ পরাধীনতার জাল হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছিল। তাহার পর সাতটি দশক অতিক্রান্ত হইয়াছে—দুইটির মধ্যে একটি দেশ সম্প্রতি চাঁদের উদ্দেশে পাড়ি দিয়াছে। বিজ্ঞানে অগ্রগতির স্বাক্ষর রাখিয়াছে। অপর দেশটি এই সাত দশকে কেবলমাত্র সন্ত্রাসবাদী তৈয়ারি করিয়াছে। বিজ্ঞানে অগ্রগতি তো দূরস্থান—সর্বক্ষেত্রেই তাহারা ক্রমাগত মধ্যযুগের অন্ধকার দিনগুলিতেই ফিরিয়া যাইতেছে। বলিয়া দিতে হইবে না—এই দুইটি দেশের ভিতর প্রথমটি ভারত এবং দ্বিতীয়টি পাকিস্তান। আরও উল্লেখ করার বিষয় এই যে, প্রায় দুই শতাধিক বৎসর ভারত যে ব্রিটিশ রাজশক্তির অধীনে ছিল, সেই ব্রিটিশরাও এতদিনে চাঁদে পাড়ি দিবার মতো মহাকাশ গবেষণায় উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করিতে পারে নাই। এশিয়া মহাদেশে ভারতের যে সকল উল্লেখযোগ্য প্রতিবেশী দেশ রহিয়াছে, যেমন জাপান—তাহারাও কেহই মহাকাশ গবেষণায় এই সাফল্য দেখাইতে পারে নাই। ইহাদের সকলকে ম্লান করিয়া দিয়া ভারত স্বাধীনতা প্রাপ্তির মাত্র সাত দশকের মাথায় মহাকাশ গবেষণায় এই সাফল্য অর্জন করিয়াছে। স্বীকার করিতেই হইবে মহাকাশ গবেষণায় ভারতের এই সাফল্য ঐতিহাসিক। এবং বিশ্বে মহাকাশ গবেষণার ক্ষেত্রে এইটি একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপও বটে।

ভারতের চন্দ্র অভিযান অবশ্য এইবারই প্রথম নয়। ভারতের মহাকাশ গবেষণা সংস্থা ইসরো বেশ কয়েকবৎসর যাবৎই সাফল্যের সহিত মহাকাশ গবেষণার কাজ চালাইয়া যাইতেছে। ইতিপূর্বে ইসরোর মহাকাশযান মঙ্গল অভিযান করিয়াছে। ২০১৩ সালে মঙ্গলের উদ্দেশে ইসরো মহাকাশ যান উৎক্ষেপণ করে। ইহার পরও বিভিন্ন সময় উপগ্রহ উৎক্ষেপণ করিয়া মহাকাশ গবেষণায় উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করিয়াছে ভারত। এইবারই যে প্রথম চন্দ্রাভিযান করিল ভারত—এমনও নহে। ২০০৮ সালে ভারত প্রথম চন্দ্রাভিযান করে। সেই সময় চন্দ্রাভিযানের উদ্দেশ্য ছিল চন্দ্রপৃষ্ঠে খনিজ পদার্থের উপস্থিতি নির্ণয় করা। এইবারের অভিযানটি চন্দ্রাভিযান-২ নামে অভিহিত হইতেছে। ২০০৮-এ প্রথম চন্দ্রযান উৎক্ষেপণের এগারো বৎসর পর এই বৎসর ২২ জুলাই চন্দ্রযান-২ চাঁদের উদ্দেশে পাড়ি দিয়াছে। এইবার অভিযানের মূল উদ্দেশ্য চাঁদের অভ্যন্তরে জলের অস্তিত্ব খুঁজিয়া বাহির করা। এই গবেষণায় সফল হইলে মহাকাশ গবেষণার এক নূতন দিগন্ত উন্মোচিত হইবে।

এইবারের চন্দ্রাভিযান উৎক্ষেপণের বিষয়টি আরও একটি কারণে স্মরণীয় হইয়া থাকিবে। ভারত সীতা-সাবিত্রীর দেশ। এই দেশেই দেবী দুর্গা মাতৃরূপে পূজিতা হন। রানি লক্ষ্মীবাঈ হইতে প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারের মতো মহীয়সী মহিলারা এই দেশেই তাঁহাদের বীরগাথা রচনা করিয়া গিয়াছেন। এই মাতৃশক্তিকে ভারত বরাবরই সম্মান জানাইয়াছে। এইবারও এই চন্দ্রাভিযান ২ উৎক্ষেপণের ক্ষেত্রেও এই মাতৃশক্তিরই জয় জয়কার। এইবারের চন্দ্রাভিযান ২ উৎক্ষেপণের দুই পরিচালকই নারী—মুথিয়া ভ্যানিথা এবং ঋতু কারিবলে। ইহা আবার প্রমাণ করিয়াছে, ভারত যেমন মাতৃশক্তিকে সম্মান জানায়, তেমনই নারী সশক্তিকরণের জন্যও সদা সচেষ্ট থাকে। নারীশক্তিকে বোরখার অন্তরালে লুকাইয়া রাখিতে ভারত চাহে না।

ভারতে বিজ্ঞান গবেষণার ইতিহাস সহস্র বৎসরের প্রাচীন। ভারত প্রথম শূন্য আবিষ্কার করিয়াছে। জ্যোতির্বিজ্ঞান ভারতেরই দান। ভারতের ঔপনিষদিক ঋষিরাই প্রথম ঈশ্বরকণার সন্ধান দিয়াছেন। চিকিৎসা বিজ্ঞানেও সুশ্রুত-চরক প্রমুখ স্মরণীয় হইয়া আছেন। মানব দেহে অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে চিকিৎসা ভারতের মাটিতেই প্রথম সম্ভব হইয়াছিল। চন্দ্রের পথে চন্দ্রযান-২-এর পাড়ি দেওয়া এই সমৃদ্ধ অতীতেরই ধারাবাহিকতা। বিজ্ঞান গবেষণায় জগৎ সভায় ভারত তাহার শ্রেষ্ঠ আসনটি বহু পূর্বেই লাভ করিয়াছে।

সুভাষিতম্

ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহুঃ ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ।
মনসস্তু পরা বুদ্ধিঃ যো বুদ্ধেঃ পরতস্তু সঃ।। (গীতা ৬/৪২)

স্থূল শরীর হতে ইন্দ্রিয় শ্রেষ্ঠ, ইন্দ্রিয় থেকে মন শ্রেষ্ঠ, মন হতে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ, বুদ্ধি হতে যা অতিশয় শ্রেষ্ঠ তা হলো আত্মা।

ঊনপঞ্চাশী 'বুদ্ধিজীবী' ও তাঁদের স্বরূপ

প্রধানমন্ত্রীকে ৪৯ জন 'বুদ্ধিজীবী' চিঠি লিখে অভিযোগ করেছিলেন দেশে ক্রমবর্ধমান 'অসহিষ্ণুতা' প্রসঙ্গে অনুরোধ করেছিলেন তিনি যেন ব্যবস্থা নেন। এর পাল্টা ৬২ জন সংবেদনশীল বিশিষ্ট নাগরিক প্রধানমন্ত্রীর কাছে পত্র প্রেরণ করেন, ওই ৪৯ জনের প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আলোকপাত করার জন্য। এখন দেশের যা পরিস্থিতি তাতে এধরনের বাদ-প্রতিবাদ চলবে। 'বুদ্ধিজীবী'র তকমাধারী ওই ৪৯ জন, যার মধ্যে ২২ জনই আবার বাঙ্গালি। এক জনপ্রিয় 'অভিনেত্রী'কে সামনে বসিয়ে এদের প্রত্যেকের মুখোশ খুলে দিয়েছেন সাংবাদিক অর্ণব গোস্বামী। তাঁর রিপাবলিক টিভিতে নেওয়া অভিনেত্রীটির সাক্ষাৎকার, মুসলমান তোষণে তাদের নীরব থাকা নিয়ে অর্ণবের তীব্র আক্রমণ আর তার জবাব দিতে না পারা— এই ধরনের 'বুদ্ধিজীবী'দের চরিত্র বঙ্গের মানুষ আগেও জানতেন যদিও, তবুও ভাইরাল হওয়া ভিডিয়োটি 'বাঙ্গালি'দের বিস্তর আমোদ জুগিয়েছে। এরপরও নাটকেরও অন্ত নেই। একজন 'অভিনেতা' আবার বলেছেন, প্রধানমন্ত্রীকে অসহিষ্ণুতা নিয়ে লেখা চিঠি লেখার পর নাকি তাঁকে খুনের হুমকি দেওয়া হচ্ছে।

এই অভিনেতাটি একটি বৈদ্যুতিক 'জনপ্রিয়' সংবাদ চ্যানেলে ঘণ্টাখানেকেই বসুন বা আধঘণ্টা, সময়-সুযোগ পেলেই বিজেপি আর প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে হেট-ক্যাম্পেন চালান, তিনি একটি ফুটবল টিমের সমর্থক হওয়ায় বিপক্ষ প্রতিদ্বন্দ্বীর সম্পর্কে 'আই হেট' শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন বহু আগে, ওই বৈদ্যুতিন মাধ্যমটির যদিও তখন জন্ম হয়নি কিন্তু তার মুদ্রণ বিভাগটি ছিল। আবার তৃণমূলের পদলেহী একটি সংবাদপত্রে একবার লেখা হয়েছিল অভিযোগকারী ওই 'অভিনেতা'টি নাকি বার দু'য়েক তাঁর মা-কে খুনের চেষ্টা করেন। গুণধর 'অভিনেতা'র এই চেষ্টা আজীবন ব্যর্থ হোক, ভগবানের কাছে এই প্রার্থনা করি। যাই হোক, আসল কথা হলো এক 'হেট ক্যাম্পেনার' এখন নাটক করতে অনেক কিছুই বলতে পারেন, চিলে কান নিয়ে উড়ে গেছে রব শুনে কানের পেছনে ছোটাটা ঠিক হবে না।

প্রধানমন্ত্রীর কাছে 'অসহিষ্ণুতা' নিয়ে অভিযোগকারী ৪৯ জনের 'বায়োডেটা' তুলে ধরলে এমন অনেক কুকীর্তিরই পরিচয় পাওয়া যাবে। এইসব কাদা ঘাঁটায় আমরা খুব বিশ্বাসী নই। কিন্তু এই বুদ্ধিজীবীদের অন্যতম মহামান্য এক 'কবি'র কন্যা কর্তৃক পরিচালিত একটি সংবাদমাধ্যম, যার সম্পাদকীয় দপ্তর ও নিউজ রুম এই মুহূর্তে 'আরবান নকশাল' দ্বারা

বিশ্বামিত্রর কলম

অধিগৃহীত ও পরিচালিত, যেভাবে এই ধামাধরা, ব্যক্তিগতভাবে অত্যন্ত অসৎ 'বুদ্ধিজীবী' তকমার সুযোগ গ্রহণকারীদের সম্বন্ধে সাধারণের শ্রদ্ধা আদায়ের অপচেষ্টা করছে তার বিরুদ্ধে পশ্চিমবঙ্গ ও দেশের মানুষকে সচেতন করাটা জরুরি।

আসলে বিষয়টা ৪৯ বনাম ৬২ নয়, তৃণমূল ভার্সেস বিজেপি নয়, এমনকী হিন্দু বনাম মুসলমানও নয়। প্রবাদ রয়েছে ঘরপোড়া গোরু সিঁদুরে মেঘ দেখলে ডরায়। দেশভাগের বীভৎসতার শিকার হিন্দুরা হলো ঘরপোড়া গোরু। কিন্তু এতকালের একটা প্রবাদ যে কীভাবে নস্যাৎ হতে পারে, তা হিন্দুরা দেখালেন বটে। উদ্বিগ্ন হবার মতো অনেক আভাস পেয়েও তাঁরা চুপ ছিলেন, ধর্ম আফিমের মৌতাতে তাঁরা এতদিন মশগুল ছিলেন। মমতা ব্যানার্জির মুসলমান তোষণ নামে জিওন কাঠির স্পর্শে সেই মৌতাত এখন কেটে গিয়েছে। বাপ-ঠাকুর্দাকে অস্বীকার করা প্রজন্ম এখন বুঝতে পারছে, ভিটে মাটি চাঁটি হওয়ার পিতৃভাগ্য তাদেরই ললাট-লিখন হয়ে দাঁড়িয়েছে দীর্ঘকাল চোখ-কান বন্ধ রাখার কারণে। 'লাল পার্টি করেপুকার' স্লোগানে আকাশ-বাতাস ভরিয়ে তোলা শেষ বয়সের মানুষগুলো এখন আবার তাঁদের শৈশবে ফিরে গিয়েছেন, বুঝেছেন দীর্ঘদিন মার্কসীয় সংস্কৃতির চর্চা করতে গিয়ে পরবর্তী প্রজন্মের জন্য তাঁরা তাঁদের পিতৃপুরুষের ভাগ্যকেই লিখে দিয়ে যাচ্ছেন।

যার নিট ফল, কমিউনিস্ট পার্টির ভোট সাত শতাংশে নেমে যাওয়া। এরপরও যেভাবে 'শুভবুদ্ধি উদয়ে'র তাগিদে তাঁরা 'প্রতিযোগিতামূলক সাম্প্রদায়িকতা', 'ক্রিকেটে বাংলাদেশই সেরা, ভারত নয়' গোছের তত্ত্ব হাজির করছেন তাতে স্বাধীনতাপূর্ব অতীতের ব্রিটিশ দালালি, স্বাধীনতা উত্তর অতীতের চীন-দালালি আর জন্মলগ্ন থেকে মুসলিম লিগের দালালি আর পাক সমর্থক এই দলটির সংরক্ষণ প্রয়াস অবিলম্বে ভারতীয় জাদুঘরের পক্ষে নেওয়া উচিত, অন্তত 'অশুভ শক্তি'র কিছু স্যাম্পেলও তো ভবিষ্যতের 'শক্ত ভারত, সমর্থ ভারত'-এর অধিবাসীরা দেখতে চাইতে পারেন!

'দল মরে, মতাদর্শ তো মরে না' গোছের তত্ত্ব বহুদিন এরা চালু রেখেছিল, আজ তার প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে ঊনপঞ্চাশী 'বুদ্ধিজীবী'দের দৌলতে। 'এক বৃন্তে দুটি কুসুম'-এর কবি এক ভেবে লিখেছিলেন, এখন হয়েছে আরেক। মুসলমান মৌলবাদকে প্রশ্রয়, 'পাকি আমাদের ভাই', 'মোদী শত্তুর তো ভারত শত্তুর' এই যাঁদের মনোবৃত্তি তাঁরা প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি লিখে 'অসহিষ্ণুতা' নিয়ে সরব হবেই, এর পেছনে পেট্রোডলারের ইন্ধন থাকতে পারে, পররাষ্ট্রের মদত থাকার সম্ভাবনাও বিচিত্র নয়। ভুলে গেলে চলবে না এদের মতো স্বার্থান্বেষী লোকেরা হাতে টাকা পেলে সব করতে পারে, হনুমান চালিশা থেকে জিল্যাক্সোর বিজ্ঞাপন পর্যন্ত। 'সম্প্রীতি'র খোয়াব দেখিয়ে এরা দীর্ঘদিন দেশের সর্বনাশ করে এসেছে, এদের 'সম্প্রীতি' ভারতে পাক-পতাকা তোলায়, মেটিয়াবুরুজ রাজাবাজার থেকে ধুলাগড়, দেগঙ্গা সর্বত্র ছোটো ছোটো পাক উপনিবেশ গড়ে তোলায়। আর ভারত থেকে পশ্চিমবঙ্গকে বিচ্ছিন্ন করার কৌশলে এই 'সম্প্রীতি' তত্ত্ব বাংলাদেশ থেকে ভারতে 'এথনিক ক্লিনসিং' (মূলবাসী নিধন)-এর পটভূমি তৈরি করেছে, যার সিক্যুয়েল (উত্তরভাগ) হলো মুসলমান-দলিত ঐক্য তত্ত্ব।

সুতরাং সাধু সাবধান! ■

তৃণমূল তবে উঠেই গেল!

প্রিয় পাঠক-পাঠিকা,

খোলা চিঠির এমন শিরোনাম দেখে রাগ করবেন না প্লিজ। আসলে সেদিন যা দেখলাম তার পরে আর চিন্তা না করে পারছি না। আহা কী দেখিলাম। জন্ম জন্মান্তরেও ভুলিব না। দিদির ডান হাতে রিমোট। বাঁ হাতে মাইকটা ধরা।

রিমোটের বোতাম টিপতেই মঞ্চের ব্যাকড্রপে নীল স্যাটিন কাপড়টা সরে গেল। বেরিয়ে এলো ক্যাম্পেন ব্যানার,— 'দিদিকে বলো'- 'আপনার কোনও সমস্যা বা মতামত থাকলে আমাকে ফোন করুন।'

এর দু' মিনিট আগে দিদি এও জানিয়েছেন, একটা ওয়েবসাইট খোলা হয়েছে। যার নাম, দিদিকে বলো. কম।

ভরা প্রেক্ষাগৃহ। শ্রোতার আসনে মন্ত্রী, বিধায়ক, জেলা পরিষদের সভাধিপতি, পুরপ্রধান, উপ পুরপ্রধান এবং তৃণমূলের নানা স্তরের নেতা। মঞ্চে উপস্থিত মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও। এই আবহেই দলের মহাসচিব পার্থ চট্টোপাধ্যায় সভার সূচনা করার পর পিছনের বিশাল পর্দায় ভেসে উঠল তৃণমূলের 'জনসংযোগ কর্মসূচি।' ছবি ও লেখা-সহ 'ভিসুয়াল প্রেজেন্টেশন।' পর্দায় একের পর এক টানা ৬ মাসের করণীয়।

প্রেক্ষাগৃহের বাইরে পরপর রেজিস্ট্রেশন কাউন্টার। প্রতিটি জেলার জন্য আলাদা করা সেই কাউন্টারে 'ভিলেজ ভিজিট কিটস' বিলির ব্যবস্থা। সভামঞ্চের প্রবেশ পথে আলাদা করে দেওয়া দিকনির্দেশ, কোন 'গেট' কার জন্য। শুধু তা-ই নয়। নজরুল মঞ্চে তৃণমূলের সাংগঠনিক বৈঠক ঘিরে এই ব্যবস্থার দায়িত্বে ছিলেন কালো টি-শার্টে এক ঝাঁক গাইড-যুবক। একেবারে কর্পোরেট ধাঁচে তাঁরাই সামলাচ্ছিলেন রাজ্যের শাসক দলের জনসংযোগের দীর্ঘমেয়াদি কর্মসূচি।

ক্ষমতায় আসার আগে থেকে এই রকম অসংখ্য সাংগঠনিক বৈঠক করেছেন তৃণমূল নেত্রী। কিন্তু এ দিনের বৈঠকের চেহারাই ছিল আলাদা। প্রত্যেকটি প্রবেশপথে পুলিশ থাকলেও কোনও দলীয় সভায় যা দেখা যায়নি, সভা শেষের পরেও প্রায় শ' খানেক গাইড বাইরের কাউন্টার থেকে 'ভিলেজ ভিজিট কিটস' তুলে দিয়েছেন তৃণমূলের বিধায়কদের হাতে। গ্রামে গ্রামে জনসংযোগ বাড়াতে গিয়ে কী করণীয়, তার প্রচার সামগ্রী ঠাসা ওই কিটসে নির্দিষ্ট লক্ষ্য ও পরিকল্পনা স্পষ্ট।

এদিন সাংবাদিক বৈঠকের স্থানও অনেক আগে থেকে মণ্ডপ বেঁধে তৈরি করা ছিল। যা আগে কখনও হয়নি। সাংবাদিক সম্মেলনের পাশাপাশি দলের রুদ্ধদ্বার বৈঠকেও মমতাকে কাগজ দেখে বলতে দেখা গিয়েছে। যা মমতার ক্ষেত্রে একেবারেই নতুন।

তা ভালো! কিন্তু প্রশ্ন হলো, গত প্রায় তিন দশকে তৃণমূলের সংস্কৃতিতে এমন কি আগে দেখা গেছে? তবে কি তৃণমূল বদলে গেল? কর্পোরেটাইজেশন হয়ে গেল বাংলার মা-মাটি-মানুষের পার্টির?

সাংবাদিক বৈঠক সেরে বেরিয়ে যাওয়ার সময় ঠিক এই প্রশ্নটাই দিদিকে করেছিলেন এক সাংবাদিক। জবাবে মমতা অবশ্য বলেন, "না তা কেন, মর্ডানাইজেশন (আধুনিকীকরণ) বলতে পারেন।"

বুদ্ধবাবুর স্লোগান মনে পড়ছে। তৃণমূল কংগ্রেসের বিকল্প আধুনিকতর তৃণমূল কংগ্রেস। ভাইদের হজম হবে তো!

—সুন্দর মৌলিক

বিশ্ব অর্থনীতিতে নিয়ামক হওয়ার সুযোগ রয়েছে

অতিথি কলম



অরবিন্দ পানাগড়িয়া

পেছন দিকে কেউ লাফ মারে না। লাফ দিতে হলে সামনেই দিতে হবে। চীন, দক্ষিণ কোরিয়া, তাইওয়ান, সিঙ্গাপুর, হংকং-এর মতো দেশ জাতীয় বৃদ্ধির অবিশ্বাস্য সীমা যখন স্পর্শ করেছিল তখন সকলেরই কিন্তু শ্রম বাজার ছিল নিতান্তই উন্নয়নের পক্ষে সহায়ক। কোনো কঠিন আইনের নিগড়ে বাঁধা নয়, এই দেশগুলি যখন বিশ্বের কাছে তাদের অর্থনীতিকে খুলে দেয় সে সময় তাদের শ্রম বাজারের নিয়ম কানুনের নমনীয়তার ফলে বিদেশি বিনিয়োগকারীরা কম খরচে অতিকায় সব উৎপাদন কেন্দ্রে অত্যন্ত শ্রমনিবিড় সব উৎপাদন যেমন— জামাকাপড়, জুতো আসবাবপত্র ও অন্যান্য হালকা জিনিসপত্র বিপুল পরিমাণে তৈরি করে বিদেশে রপ্তানি করতে থাকে।

এর ফলস্বরূপ দেশের অভ্যন্তরে প্রচুর চাকরির সৃষ্টি হয়, যেখানে মাইনেপত্তরও মোটেই খারাপ ছিল না। মাত্র দু' তিনটি দশকের মধ্যেই এই দেশগুলির নিঃসীম দারিদ্র্য সম্পূর্ণ দূরীভূত হয়।



> দেশের বিভিন্ন ভৌগোলিক অঞ্চলে ন্যূনতম জীবনযাপনের খরচের ভিত্তিতে যদি পরিপূরক বেতন নির্ধারণ করতে হয় সেক্ষেত্রে সেখানকার রাজ্য সরকারগুলিই একাজে উপযুক্ত বলে মানতে হবে।

ভারতও তার অর্থনীতিকে ৯০-এর দশকের সংস্কার প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে বিশ্ব বাজারের কাছে খুলে দিয়েছে। কিন্তু ভারতে বহাল থাকা অনড় কিছু শ্রম আইনের দাপটে বড়ো বড়ো শিল্পের দেশে উৎপাদন প্রক্রিয়া শুরু করার পথে বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এর ফলে প্রচুর লোক লাগে এবং ভালো মাইনে পাওয়া যায় এমন সব ক্ষেত্রগুলিতে কোনো বিনিয়োগই হচ্ছে না। শিল্প ক্ষেত্রে সফল হওয়া তথ্য প্রযুক্তি, ওষুধ, যন্ত্রপাতি, গাড়ি ও তৈল সংশোধনাগারগুলিতে বড়ো আকারের পুঁজি ও কেবলমাত্র উচ্চ প্রশিক্ষিত লোকজনই নিয়োজিত হয়।

এই পরিস্থিতি কিন্তু ভারতের দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার রূপকার প্রয়াত প্রশান্ত চন্দ্র মহলানবিশ অনেক আগেই ভবিষ্যদ্‌বাণী করেছিলেন। সেই কবে ১৯৬১ সালে ভারতীয় শ্রম আইন সম্পর্কে তিনি লিখেছিলেন ভারতের আইনগুলি 'Probably the most highly protective of labour interests in the narrowest sense, in the whole world' তিনি আরও লেখেন ভারতবর্ষের বর্তমানে প্রচলিত আইন সংগঠিত শ্রমিকশ্রেণীকে (যারা সমগ্র জনসংখ্যার ৫-৬ শতাংশ মাত্র) নিরাপত্তা দিতে দেশের সামগ্রিক বৃদ্ধির পথকে রুদ্ধ করেছে। নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে শ্রমিক শ্রেণীর সংখ্যার ওপর যে সমীক্ষা চালানো হয় তার অন্তর্গত ২০১৭-১৮ সালের পরিসংখ্যানগুলি দেখলে বোঝা যায় মহলানবিশ কী অভ্রান্ত বিশ্লেষক ছিলেন। তথ্যে উঠে এসেছে ভারতের শ্রমজীবী

মানুষের ৪৪ শতাংশ নিযুক্ত আছে কৃষিতে, ৪২ শতাংশ আছে এমন ছোটো কলকারখানা বা উদ্যোগে যেখানে শ্রমিকদের সংখ্যা ২০-র বেশি নয়। পেশাদারিত্বের অভাব ও নীচু মানের উৎপাদনশীলতা এই সমস্ত উদ্যোগের বিশেষত্ব।

এই পরিপ্রেক্ষিতে শ্রম আইন সংস্কারে যে চারটি ক্ষেত্রে পরিবর্তন আনার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে তা একান্ত জরুরি। (১) বেতন, (২) সামাজিক নিরাপত্তা, (৩) শিল্পক্ষেত্রে পারস্পরিক সম্পর্ক, (৪) কর্মীদের নিরাপত্তা— এই চারটি ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সংশোধন আনতে পারলে আমাদের শ্রম বাজার নিশ্চিত নিয়োগের উপযুক্ত হয়ে উঠবে। কিন্তু এই কাজ সফল করতে গেলে চালু আইনকে কেবল পর্যালোচনা করলে হবে না। উল্লেখিত চারটি ক্ষেত্রে পুরোপুরি খোলনলচে বদলাতে হবে।

উদাহরণ দেওয়া যায় খসড়া বেতন কোড নিয়ে। সংবাদ সূত্রের খবর অনুযায়ী বর্তমানে প্রচলিত বহু সংখ্যক বেতন সংক্রান্ত আইনকে একটি ছাতার তলায় আনার প্রস্তাব রয়েছে। অর্থাৎ পুরনো সবই এক জায়গায় এসে জড়ো হলো। এতে হবে না। শ্রমিকদের কাজ দিতে নিয়োগকর্তাকে যেন পাঁচবার না ভাবতে হয় এমন নিয়োগ-বন্ধু আইন আনতে হবে। প্রস্তাবিত আইন অনুযায়ী উচ্চ প্রশিক্ষণ প্রাপ্তরাই কেবল ন্যূনতম বাড়তি বেতনক্রমের অধীনে আসবে। পৃথিবীর অন্য কোনো দেশে এমন ব্যবস্থা চালু নেই। যে দেশের সমাজে বাঁচার পক্ষে যে ন্যূনতম ভদ্রজনোচিত জীবন যাত্রার মান বলবৎ আছে সমস্ত শ্রমিকেরই সেই জীবন যাপনের উপযুক্ত বেতন সুনিশ্চিত করাই একমাত্র নৈতিক যুক্তি। জীবনযাত্রার এই ন্যূনতম প্রচলিত মান অনুযায়ী বেতন পেতে গেলে উচ্চ প্রশিক্ষণের মানদণ্ড বেঁধে দেওয়া যায় না।

একটি সর্বনিম্ন ও সর্বজনগ্রাহ্য বেতন স্তর নির্ধারিত করে দেওয়ার পর বেতন বাজারের শক্তির ওপর নির্ভর করবে। এর মধ্যে কার কি উচ্চ প্রশিক্ষণ আছে সেই ভিত্তিতে শুধু তার মাইনে বাড়িয়ে দিলে হতাশার পরিবেশ সৃষ্টি হয়ে শিল্পদ্যোগের বৃদ্ধি ক্ষতিগ্রস্ত করবে। এর ফলে উদ্যোগপতি কেবলমাত্র অধিক পুঁজির ও বাড়তি দক্ষতা লাগে এমন শিল্পের দিকেই সরে যাবে, ফলে সাধারণ চাকরির বাজার মার খাবে।

সূত্র অনুযায়ী খসড়া বেতন প্রস্তাবে দেশব্যাপী একটি ন্যূনতম বেতনের কথা বলা হয়েছে। এটা পরিষ্কার হয়নি ন্যূনতম বেতন কি মেট্রো শহরে বসবাস করার খরচ নির্ভর, যেমন দিল্লি মুম্বাই নাকি বিহার ওড়িশার প্রত্যন্ত অঞ্চলের খরচ নির্ভর। যদি প্রথম শহর দুটিকে মাপকাঠি ধরে ন্যূনতম বেতন ঠিক করা হয় তা হলে কিছুটা বড়ো আকারের যে শ্রমনিবিড় পোশাকপরিচ্ছদ ও জুতো তৈরির উদ্যোগগুলি রয়েছে সেগুলির বিলুপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল।

এই দুটি শিল্পদ্যোগের ক্ষেত্রে লাভের মাত্রা খুবই কম। মেট্রো শহরে বসবাসের উপযোগী ন্যূনতম বেতন দেওয়ার বাধ্যবাধকতা এদের ওপর চাপানো হলে এদের অস্তিত্বই সঙ্কটের মুখে পড়বে। উল্টো দিকে যদি বিহার ওড়িশার প্রত্যন্ত প্রদেশের নিতান্ত গরিব শ্রমিকদের দৈনিক মজুরির ভিত্তিতে সারাদেশের শ্রমিকের মজুরি নির্ধারিত হয় সেক্ষেত্রে অন্য বিপদ। সংগঠিত ক্ষেত্রের উচ্চ বেতনের শ্রমিকরা এতে অগ্নিশর্মা হয়ে উঠবে। আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংগঠনগুলি যেমন International labour organisation-গুলির তরফে কেবলমাত্র বিক্ষোভ জানাবে। এছাড়াও আন্তর্জাতিক শ্রম আইন ভাঙার অভিযোগও আসবে।

সারাদেশে একটি মাত্র ন্যূনতম বেতন হার ঠিক করার সপক্ষে কয়েকটি অযৌক্তিকতা নজরে পড়ে। একথা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই যে বিশ্বের বেশ কয়েকটি সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত অর্থনীতিতে এই নিয়ম অনুসরণ করা হয়। অন্যদিকে দেশের বিভিন্ন ভৌগোলিক অঞ্চলে ন্যূনতম জীবনযাপনের খরচের ভিত্তিতে যদি পরিপূরক বেতন নির্ধারণ করতে হয় সেক্ষেত্রে সেখানকার রাজ্য সরকারগুলিই একাজে উপযুক্ত বলে মানতে হবে। একটি রাজ্য সরকার তার ও তার পূর্বের সরকারগুলির অভিজ্ঞতার সূত্রে রাজ্যবাসীর খেয়ে পরে বেঁচে থাকার ক্ষেত্রে বেতনের ন্যূনতম সীমা যা জীবনযাত্রার মানও অক্ষুণ্ণ রাখতে পারে তা নির্ধারণ করতে সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত একথা নিশ্চিত। তাই আমার বিবেচনায় এ কাজটা রাজ্যগুলির হাতেই ছেড়ে দেওয়া উচিত যেমন পৃথিবীর গরিষ্ঠাংশ দেশে আছে।

প্রস্তাবিত খসড়া বেতন নির্ধারণ সূত্রটিতে কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে রেল ও খনি শিল্পেরও বেতন কাঠামো সংস্কারের প্রসঙ্গ রয়েছে। একই সঙ্গে এই দুটি ক্ষেত্রকে পরিধির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করার যৌক্তিকতা বোঝা বেশ মুশকিল। পূর্বে আলোচিত রাজ্যগুলির হাতে যদি সেখানকার অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিবেশ অনুযায়ী কর্মীদের ন্যূনতম বেতন নির্ধারণের পূর্ণ অধিকার দেওয়া হয় সেক্ষেত্রে সেই রাজ্যের সমস্ত ধরনের (সরকারি-বেসরকারি) নিয়োগকর্তারা সেই বেতনই কর্মীদের দিতে বাধ্য থাকবেন। সমাজের কাছে গ্রহণযোগ্য জীবনযাপনের পক্ষে ন্যূনতম বেতন কি পোশাক তৈরি করা শ্রমিকদের ক্ষেত্রে রেলে বা খনিতে কাজ করা শ্রমিকদের থেকে বেশি বা কম হওয়া উচিত!

ভালো চাকরি, জীবনযাপনের ক্রম উন্নতমানের সঙ্গে খাপ খাওয়ানো চাকরি তৈরি করতে শ্রম আইন যা শ্রমিক মালিক সম্পর্কের মধ্যে সেতু তৈরি করে তার দিকে নজর দিতেই হবে। বৃহত্তর জন পরিসরে ন্যূনতম বেতন কাঠামো নিয়ে নীতি পরিমার্জন ও নির্ধারণ নিয়ে তেমন কোনো আলোচনাই হয়নি। প্রস্তাবের অন্তর্বস্তু সম্পর্কে বৃহত্তর জনগোষ্ঠী আদৌ ওয়াকিবহাল নয়।

তাই পর্যাপ্ত মত বিনিময় ও ভাবনার আদানপ্রদান ছাড়া এত বড়ো সংশোধনী যদি হঠাৎ মন্ত্রীসভায় পৌঁছে যায় ও তাদের অনুমোদন নিয়ে সংসদ ভূমিতে ঢুকে পড়ে তাহলে সেটা উদ্বেগজনক। কেননা বর্তমানে চালু থাকা বেতনক্রম সংক্রান্ত আইন-কানুনগুলিতে কাম্য সংস্কারগুলি যদি অধরাই থাকে বা এমন কিছু নতুন তৈরি হয় যেগুলি হয়তো পক্ষান্তরে চালু থাকা আইনের হাতকেই অজান্তে শক্ত করে ফেলবে, সেক্ষেত্রে বিপদ বাড়বে। ■

রম্যরচনা

পল্টুর বাবার রিপোর্ট কার্ড

পল্টুর বাবা অফিস থেকে ফিরতেই পল্টু ছুটে এল রিপোর্ট কার্ড হাতে নিয়ে। রিপোর্ট দেখে তো বাবা থ। অঙ্কে ১২, ইতিহাসে ৭, ভূগোলে ১৫, ইংরেজিতে ২০ আর বাংলায় ১৮। পল্টু বাবা চেঁচিয়ে বলে উঠল– এত পয়সা খরচ করে তোমাকে লেখাপড়া শেখাচ্ছি, শেষে এই? কোনো বিষয়ে পাশ করতে পারোনি। হতভাগা, কালই আমি তোমার স্কুল ছাড়িয়ে দেব।চেঁচামেচি শুনে পল্টুর মা ঘর থেকে ছুটে এসে বলল– আরে থামো থামো। ওর কথাটা তো একটু শোনো। পল্টুর বাবা বলল– কী আর শুনব। তবু বলছ যখন শুনি। পল্টু কাঁচুমাচু মুখে বলল– আজ পুরনো সব কাগজপত্র ঘাঁটছিলাম। ঘাঁটতে ঘাঁটতে তোমার স্কুলের এই পুরনো রিপোর্ট কার্ডটা পেলাম।

* * *

চন্দ্রযান থেকে পশ্চিমবঙ্গের ছবি

ইসরো থেকে পাওয়া খবর অনুযায়ী চন্দ্রযান-২ পৃথিবীর যে ছবি পাঠিয়েছে তাতে শুধু পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়নেরই নানা দিক ফুটে উঠেছে। বাকি পৃথিবী সম্পূর্ণ অন্ধকার। ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় উষ্মা প্রকাশ করে বলেছেন–' চাঁদের মানুষের যেটুকু কৃতজ্ঞতবোধ আছে পশ্চিমবঙ্গের মানুষের সেটুকুও নেই। না হলে কী আর বিজেপি এখানে ১৮ টা সিট পায়।'



উবাচ



"গণপিটুনি ও গোরুর নামে হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতিকে বদনাম করার চেষ্টা চলছে। বেশ কিছু রাজ্যে এসব হিংসাত্মক ঘটনা ঘটিয়ে হিন্দুধর্মকে বদনাম করে ধর্মান্তকরণের চক্রান্ত চলছে।"

মোহনরাও ভাগবত
সরসঙ্ঘচালক,
আরএসএস

বৃন্দাবনে সামাজিক সদভাবনা সমিতির বৈঠকে বক্তব্য



"মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তোষণ নীতির জন্যই এ রাজ্যের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিঘ্নিত হচ্ছে। আমি মনে করি সমস্ত নাগরিককে সমান চোখে দেখা উচিত মুখ্যমন্ত্রীর।"

কেশরীনাথ ত্রিপাঠী
পশ্চিমবঙ্গের বিদায়ী
রাজ্যপাল

রাজভবনে সংবাদ সংস্থার সঙ্গে সাক্ষাৎকারে



"দেশের সুরক্ষার সঙ্গে কোনো কিছুতেই আপোশ নয়। কার্গিলের যুদ্ধে যারা হেরেছিল, তারা এখন ছায়াযুদ্ধের মাধ্যমে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার চেষ্টা করছে এবং সন্ত্রাসে মদত দিচ্ছে।"

নরেন্দ্র মোদী
ভারতের প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লিতে কার্গিল বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তব্য



"পঞ্জাবে এখন নেশার রমরমা চলছে। এর প্রধান কারণ মাদক পাচারকারীদের সঙ্গে কংগ্রেসের যোগসাজস। মুখ্যমন্ত্রী ক্যাপ্টেনের অবশ্য তাতে কোনো হেলদোল নেই।"

সুখবীর সিংহ বাদল
অকালি দলের নেতা

পঞ্জাবে মাদক ব্যবসার বাড়বাড়ন্ত প্রসঙ্গে

রাজ্যপালই রাজ্যের প্রকৃত শাসনকর্তা

ড. নির্মলেন্দু বিকাশ রক্ষিত

গত পঞ্চায়েত নির্বাচনের সময় থেকেই পশ্চিমবঙ্গে একটা অরাজকতা চলছে। হানাহানি রক্তারক্তি, খুনখারাপি, গণ্ডগোল, গৃহদাহ, দলীয় অফিস ধ্বংস ইত্যাদি চলছে অবাধে।

এই নিয়ে রাজ্যবাসী অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছেন। রাজ্যের প্রধান শাসক রাজ্যপাল কেশরীনাথ ত্রিপাঠী তিতিবিরক্ত হয়ে ক্ষোভ ও উষ্মা প্রকাশ করেছিলেন। তিনি এই ব্যাপারে কেন্দ্রের কাছে তাঁর রিপোর্টও পাঠিয়েছিলেন।

এতে অবশ্য রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ও শাসক দলের নেতাদের অনেকেই ক্ষুণ্ণ হয়েছিলেন। তাঁদের মতে, এভাবে রাজ্যপাল তাঁর বিরূপ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে পারেন না, এতে যুক্তরাষ্ট্রীয় নীতিও নাকি লঙ্ঘিত হয়েছে।

অবশ্যই অজ্ঞতা থেকে ভ্রান্তির সৃষ্টি হয় এবং ভ্রান্তি এনে দেয় প্রতারণার রাজনীতি। সংবিধানের মলাট উল্টে একটু দেখলেই জানা যাবে যে, রাজ্যপালের কাজ শুধু রাজভবনে থাকা-খাওয়া-শোওয়া নয়।

আসলে, রাজ্যপাল রাজ্যের প্রধান। সংবিধানের ১৫৪ (১) নং অনুচ্ছেদে আছে— 'The exceutive power of the state shall be vested in the Governor।' সুতরাং মুখ্যমন্ত্রী নন--- রাজ্যপালই হলেন রাজ্যের শাসনকর্তা। তিনি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে রাজ্যশাসন করতে পারেন।

তাছাড়া ১৫৯ নং অনুচ্ছেদ জানিয়েছে যে, শপথ গ্রহণের সময় তিনি ঈশ্বরের নামে বা বিবেকের কাছে প্রতিজ্ঞা করেন— তিনি সংবিধান ও আইনকে রক্ষা করবেন ('preserve, protect and defend') এবং রাজ্যবাসীর কল্যাণের ('well being') জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করবেন। সুতরাং তার দায় রাজ্য-মন্ত্রীসভার কাছে নয়--- তিনি সংবিধান, আইন ও জনকল্যাণকেই গুরুত্ব দিতে বাধ্য। সেক্ষেত্রে যদি তাঁর মনে হয় মন্ত্রীসভার কোনো নীতি বা কাজ সংবিধান, আইন বা জনকল্যাণের পরিপন্থী, তাহলে তিনি সেই বিষয়ে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারেন, বাধাও দিতে পারেন চরম অবস্থায়।

এই ব্যাপারে আরও একটা কথা মনে রাখতেই হবে। রাষ্ট্রপতির ক্ষেত্রে সংবিধানের ৭ (১) নং অনুচ্ছেদ জানিয়েছে তাঁকে পরামর্শ দেওয়া ও সাহায্যকারী (to aid and advise) মন্ত্রীসভা থাকবে প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে। কিন্তু তিনি এই পরামর্শ ও সাহায্য নিতে বাধ্য কিনা, সংবিধান সেই বিষয়ে ছিল নীরব। তবে সংসদীয় ব্যবস্থায় সাধারণত রাষ্ট্রপ্রধান তাঁর ক্যাবিনেটের পরামর্শেই চলেন। তাছাড়া ১৯৭৬ সালে ৪২তম সংবিধান সংশোধন উক্ত অনুচ্ছেদকে ভিন্ন রূপ দিয়েছে— রাষ্ট্রপতির ওপর চাপানো হয়েছে বাধ্যবাধকতা।

কিন্তু রাজ্যপালের ক্ষেত্রে এই ধরনের সংশোধন আনা হয়নি। আরও বড়ো কথা— ১৬৩ (১) নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে— রাজ্যপাল যেসব বিষয়ে তাঁর স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা প্রয়োগ করবেন না, সেই সব ক্ষেত্রেই মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে একটা ক্যাবিনেট থাকবে তাঁকে সাহায্য করা ও পরামর্শ দেওয়ার জন্য। সুতরাং বলা যায়--- রাজ্যপালকে কিছু স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে— সেক্ষেত্রে ক্যাবিনেটের কোনও ভূমিকাই নেই। বিশেষ করে এগুলো নির্দিষ্ট বা লিপিবদ্ধ করে দেওয়া হয়নি, বরং ১৬৩ (২) নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে— কোনগুলো তাঁর স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা, এই প্রশ্ন উঠলে তাঁর কথাই হবে চূড়ান্ত।

সুতরাং বলা যায়--- রাষ্ট্রপতির স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা না থাকলেও রাজ্যপালের আছে। এই কারণে ড. বি. সি. রাউত মনে করেন, তাঁরা ওই ক্ষমতা বুঝিয়ে দিতে পারে যে, 'The Governor is not a mere figurehead।' কোনো কোনো ক্ষেত্রে তিনি একটা প্রথম ভূমিকা নিতেই পারেন— 'he is expected to exercise this discretionary powers'--- (ডেমোক্র্যাটিক কন্‌স্টিটিউশান অব ইন্ডিয়া, পৃ. ২২২)। ড. পাইলির ধারণা প্রায় সব রাজ্যপালই নিম্নলিখিত ক্ষমতা এভাবে চাইবেন—

(১) জটিল অবস্থায় মুখ্যমন্ত্রীর নিয়োগ।

(২) মন্ত্রীসভার পদচ্যুতি।

(৩) বিধানসভা ভেঙে দেওয়া।

(৪) মুখ্যমন্ত্রীর কাছে তথ্য জানা।

(৫) বিলে ভেটো দেওয়া বা সেটা রাষ্ট্রপতির কাছে পাঠানো।

(৬) অর্ডিনেন্সে স্বাক্ষর দেওয়ার আগে রাষ্ট্রপতির সঙ্গে পরামর্শ করা।

(৭) জরুরি অবস্থা জারির জন্য রাষ্ট্রপতিকে রিপোর্ট দেওয়া।

(৮) অসমের ক্ষেত্রে বিশেষ অধিকার যোগ করা।

তাঁর মতে, রাজ্যপাল আদৌ নামমাত্র শাসক নন। এই ধরনের ব্যাপক ক্ষমতা আছে বলেই তিনি একটা 'vital role' পালন করতে পারেন— (অ্যান্ ইন্‌ট্রোডাকশন টু দ্য কন্‌স্টিটিউশান অব ইন্ডিয়া, পৃ. ২০৪-৫)।

তবে সংবিধান বিশেষজ্ঞ দুর্গাদাস বসু মনে করেন, রাজ্যপাল কতকগুলো নির্দিষ্ট বিষয়ে স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা ভোগ করেন— তা নয়, সেটা নির্ভর করে 'according to circumstances'— (ইন্ট্রোডাক্‌শান টু দ্য কন্‌স্টিটিউশান অব ইন্ডিয়া, পৃ. ২১০)।

একটা কথা মনে রাখতেই হবে। সংবিধানের মুখ্য রচয়িতা— ড. বি. আর. আম্বেদকর সংবিধানের শেষ দিকে একটা অধ্যায় রেখেছিলেন, তার শিরোনাম ছিল 'Instrument of Instructurs'। সেটাতে ছিল রাষ্ট্রপতি ও রাজ্যপাল কোন পরিস্থিতিতে কী করবেন। সেটা থাকলে তাঁদের আচরণবিধি অনেকটাই নির্দিষ্ট হয়ে যেত। কিন্তু শেষ পর্যন্ত অধ্যায়টাকে বাদ দেওয়া হয়েছে আর তার ফলে অন্তত

রাজ্যপালকে কলের পুতুল তৈরি করার কোনও প্রয়াস সফল হয়নি।

এই কারণে কোনো কোনো সময় রাজ্যপাল বেরিয়ে এসেছেন চেনা গণ্ডীর বাইরে। ১৯৫৯ সালে কেরলের রাজ্যপাল 'কেরল এডুকেশন বিল' স্বাক্ষর না দিয়ে রাষ্ট্রপতির কাছে পাঠিয়েছেন। ১৯৬৭ সালে পশ্চিমবঙ্গের কর্ণধার মুখ্যমন্ত্রী অজয় মুখার্জিকে বরখাস্ত করেছেন। ১৯৮২ সালে হরিয়ানার রাজ্যপাল মুখ্যমন্ত্রীপদের দুই দাবিদার ভজনলাল ও দেবীলালকে তাঁদের সমর্থকদের নিয়ে রাজভবনে হাজির হতে বলেছিলেন--- (জি. এস. পাণ্ডে--- কনস্টিটিউশনাল ল' অব ইন্ডিয়া, পৃ. ৩০০)। একবার মধ্যপ্রদেশের রাজ্যপাল বিধানসভায় ভাষণ দেওয়ার সময় গণ্ডগোল সৃষ্টিকারী সদস্যদের বহিষ্কৃত করেছেন।

এই সব কারণে ড. হরিহর দাস মন্তব্য করেছেন, 'The Governor is not a cipher'— (ইন্ডিয়া : ডেমোক্র্যাটিক গভর্নমেন্ট অ্যান্ড পলিটিক্স, পৃ. ২৭২)। অবশ্য একটা দল বা গোষ্ঠীর একক গরিষ্ঠতায় ক্ষমতা দখল করলে তিনি নিজেকে গুটিয়ে নিতে বাধ্য। কিন্তু বিশেষ পরিস্থিতিতে তিনি সক্রিয় হয়ে উঠতেই পারেন। সেই সুযোগ সংবিধানই রেখেছে।

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির-সহ কোনো কোনো নেতা বলেছেন, রাজ্যপাল যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো ভেঙেছেন। যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো ভাঙা কাকে বলে তাঁদের সেই ধারণাই নেই। রাজ্যপালকে কেন্দ্র নিযুক্ত করে (১৫৫ নং অনুচ্ছেদ) এবং যে কোনও সময় পদচ্যুতও করতে পারে— 'The Governor shall hold office during the pleasure of the president।' যুক্তরাষ্ট্রীয় ঐক্যকে সুনিশ্চিত করার জন্যই এই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে, তাই তিনি কেন্দ্রের এজেন্টও। রাষ্ট্রপতির নির্দেশ ও মুখ্যমন্ত্রীর পরামর্শ পরস্পর বিরোধী হলে তিনি প্রথমটাই মেনে নেবেন— (মরিস জোন্স গভর্নমেন্ট অ্যান্ড পলিটিক্স অব ইন্ডিয়া, পৃ. ১০০)।

সুতরাং এল. এল. সিক্রির ভাষায় বলা চলে— 'The Governnor's office is not a mere decorative emblem'--- (ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্ট অ্যান্ড পলিটিক্স, পৃ. ২৩৬)। যদি রাজ্য সরকারের নীতি ও কাজ তার পছন্দ না হয়, তিনি তার জন্য বিরূপ প্রতিক্রিয়া জানাতেই পারেন— এই মর্মে কেন্দ্রকে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য পরামর্শও দিতে পারেন। তিনি 'essential part of the constitutional machinary'— (ড. বিদ্যাধর মহাজন— দ্য কনস্টিটিউশান অব ইন্ডিয়া, পৃ. ২৮২)।

সংবিধান রচয়িতারা রাজ্যপালকে ঘুমিয়ে কাটাতে বলেননি। কোনো কোনো ক্ষেত্রে বরং তাঁরা তাঁকে সক্রিয় হওয়ার ব্যাপক ক্ষমতা দিয়েছেন। ড. এস. সি. কাশ্যপ লিখেছেন, 'There are certain areas where the Governor may have to use his own wisdom'— (আওয়ার কনস্টিটিউশান, পৃ. ২১৪)।

রাজনীতি করতে গেলে সংবিধান সম্পর্কে একটা আধটু জ্ঞান থাকা দরকার। পশ্চিমবঙ্গের শাসকদলের নেতাদের এই কথা কে বোঝাবে? ●

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের মুখপত্র

প্রণব

পড়ুন ও পড়ান

MUTUAL FUNDS Sahi Hai

হ্যাঁ! আমরাই আপনাকে দিতে পারি এক উন্নতমানের পরিষেবা

কারণ

আমাদের কাছ থেকে আপনি পাবেন

OUR PRODUCTS	OUR PLANNING
◆ Portfolio Management Services	◆ Retirement Planning
◆ Mutual Fund	◆ Pension Fund
◆ Life Insurance	◆ Children Education Fund
◆ General Insurance	◆ Daughter Marriage Fund
◆ Mediclaim	◆ Estate Creation
◆ Accidental Insurance	◆ Wealth Creation
◆ Company Bond & Fixed Deposit	◆ Tax Planning

মিউচুয়াল ফাণ্ডে SIP করুন

(সিস্টেমেটিক ইনভেস্টমেন্ট প্ল্যান)



২০০০ টাকা প্রতি মাসে যারা

১৯৯৬ সাল থেকে ২০১৬ পর্যন্ত

SIP তে নিয়মিত বিনিয়োগ করেছেন

তাদের প্রত্যেকের ফাণ্ড ভ্যালু বর্তমানে ১ কোটি টাকা

২০ বছরে মোট বিনিয়োগ ৪ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা মাত্র

DRS INVESTMENT

Mutual Fund | Insurance | Fixed Deposit | Bond

Contact : 98303 72090 / 97489 78406

Find us on Facebook E-mail : drsinvestment@gmail.com

মিউচুয়াল ফাণ্ডে বিনিয়োগ বাজারের ঝুঁকির শর্তাধীন। যোজনা সংক্রান্ত সমস্ত নথি যত্ন সহকারে পড়ুন।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

অনিবার্য কারণবশত স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্ট পরিবর্তিত হয়ে ১লা জুলাই ২০১৯ থেকে ওঁস্বস্তিক প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড হচ্ছে। তাই

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪, ৮৬৯৭৭৩৫২১৫, হোয়াটস্ অ্যাপ : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name	:	**OMSWASTIK PRAKASHAN PVT. LTD.**
A/C. No.	:	**917020084983100**
IFSC Code	:	**UTIB0000005**
Bank Name	:	**AXIS Bank Ltd.**
Branch	:	**Shakespeare Sarani, Kolkata**

রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে পিএইচডি নিয়ে ছেলেখেলা বন্ধ হোক

শুভ্র স্যান্যাল

রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়কে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী নির্দেশে কিংবা ইঙ্গিতে নীল-সাদা রং করে যাঁরা মুড়ে দিয়েছেন তাঁদের বহু কেলেঙ্কারির মধ্যে কিছু কেলেঙ্কারি প্রকাশ্যে আসতে শুরু করছে। শাসকদলের নেতা-নেত্রীদের কাটমানি খাওয়ার তালিকায় উপাচার্য অনিল ভুঁইমালি, শিক্ষক অশোক দাসের নাম জড়িয়ে দিয়েছেন রায়গঞ্জের কংগ্রেস নেতা মোহিত সেনগুপ্ত। উপাচার্য অনিলবাবু কিংবা শিক্ষক অশোক বাবু কাটমানি খেয়ে ফুলে ফেঁপে উঠেছেন কিনা সেটা তদন্তসাপেক্ষ। যদিও সেই তদন্ত কোনোদিনই হবে কি না সেটা কেউ জানে না। রাজ্যের প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয় বিপুল অংশে আর্থিক দুর্নীতিতে তৃণমূলের জেলা নেতা, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, ফিনান্স অফিসার সকলেই আকণ্ঠ ডুবে আছেন। গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে বিগত দিনে প্রায় ১০০ কোটি টাকার দুর্নীতি সংঘটিত হয়েছে জেলার তৃণমূলের নেতা, ছাত্রনেতা এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিনান্স অফিসারের মদতে।

নীল-সাদা রঙে মোড়া রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অনিলবাবুর এবং শিক্ষকদের কাটমানির খাওয়ার খবর বিস্তারিতভাবে মুখ্যমন্ত্রীর অনুগত সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত হচ্ছে। আর এবারের দুর্নীতিতে খোদ উপাচার্যের পিএইচডি'র গাইড হওয়ার মতো আরও বড়ো দুর্নীতিতে জড়িয়ে যাবার খবর প্রকাশ পাচ্ছে। তাঁরই সুপারভিশনে পিএইচডি প্রার্থীদের সমাবর্তনে সার্টিফিকেটও প্রদান করেছেন মাননীয় চ্যান্সেলর অর্থাৎ রাজ্যের রাজ্যপাল মহোদয়।

একজন উপাচার্য যিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের রেগুলার ফ্যাকাল্টি নন এবং সেই বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচডি'র রেজিস্ট্রেশন খোদ উপচার্য পেতে পারেন না এই সাধারণ বোধটুকুও কি তাঁর নেই? তাছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের স্ট্যাটুট এবং অর্ডিন্যান্স আছে সেখানে পিএইচডি'র নিয়মাবলী বিস্তারিতভাবে লেখা আছে। প্রশ্ন হলো, এই স্ট্যাটুটে যা উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের স্ট্যাটুট অনুসরণ করে তৈরি হয়েছে সেখানেও কি খোদ উপচার্যকে পিএইচডি করাবার এক্তিয়ার বা অধিকার দেওয়া হয়েছে? পিএইচডি করাবার আগে প্রার্থীকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সুপারভাইজার সহ রেজিস্ট্রেশন করাতে হয়। আর রেজিস্ট্রেশন করান স্বয়ং রেজিস্ট্রার। এখন রেজিস্ট্রার পদাধিকার বলে উপাচার্যের নীচে অবস্থান করেন। অর্থাৎ গোটা ব্যাপারটিই যথেষ্ট গোলমেলে। আর এই গোলমালের মধ্যেই উপাচার্য পিএইচডি করিয়ে ফেলেছেন যা নিয়ে বিজেপির দুই কেন্দ্রীয় মন্ত্রী দেবশ্রী চৌধুরী ও সুরিন্দর সিংহ আহলুআলিয়া সরাসরি ইউজিসির দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয় সহ অপর দুটি বিশ্ববিদ্যালয় অর্থাৎ উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় এবং গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগ, পিএইচডি ডিগ্রি, আর্থিক অনুদান সব ব্যাপারেই ভুরিভুরি অনিয়মের অভিযোগ বারবার করে ঘুরে ফিরে আসে। তাছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের একাংশের সীমাহীন লোভ, অনিয়মের সঙ্গে আপোশ, পিএইচডি পাইয়ে দেওয়ার জন্য ছাত্রীদের নামে কেলেঙ্কারি, ছাত্রদের থেকে উৎকোচ বা কাটমানি নেওয়া, পিএইচডি প্রার্থীদের থেকে বিদেশযাত্রার খরচ আদায় করা, দেশের বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণের জন্য ট্রেনের এসি ফার্স্ট ক্লাসের ভাড়া আদায় করা, দেশের বিভিন্ন হোটেল ভাড়া পিএইচডি প্রার্থীদের থেকে নিয়ে নেওয়ার ঘটনা আকছার ঘটছে। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের এক পিএইচডি প্রার্থী জানিয়েছে যে তার গাইডের 'তীর্থযাত্রার' খরচ বারবার তাকেই জুগিয়ে যেতে হয়েছে।

বছর পনেরো ধরে চেনা পরিচিত গাইডরাই এক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ঘুরে ফিরে আর এক বিশ্ববিদ্যালয়ে এক্সপার্ট হিসেবে উপস্থিত হন। অর্থাৎ পিএইচডি ইন্টারভিউ বোর্ডে বা শিক্ষক নিয়োগে সিলেকশন কমিটিতে পরিচিত লোকজনই থাকেন। এই পরিচিত লোকজনকে বলা হয় এক্সটারনাল এক্সামিনার। এটা একটা ওপেন সিক্রেট। এই এক্সটারনালরা এত অপরিচিত যে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগে অধ্যাপক বা লোকজনদের সঙ্গে এদের দহরম মহরম বহুদিনের। ক্ষেত্র বিশেষে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের অধ্যাপকরা কোন প্রার্থীকে কত নম্বর দিতে হবে আগেই এই এক্সটারনালদের বলে দেন। সেই মতো পিএইচডি ডিগ্রি দেওয়া কিংবা শিক্ষক নিয়োগ হয়ে থাকে। গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের নানা ঘাটের জল খাওয়া এক অধ্যাপক পশ্চিমবঙ্গের



বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং পশ্চিমবঙ্গ কলেজ সার্ভিস কমিশনে এক্সটারনাল হিসেবে উপস্থিত থাকেন। তাঁর জনসংযোগ এতই তীব্র যে ইন্টারভিউ হওয়ার আগে থেকেই তিনি প্রার্থীদের সঙ্গে যোগাযোগ গড়ে তোলেন। তবে এই জনসংযোগের ব্যাপারে অভূতপূর্ব নজির সৃষ্টি করে গেছেন মালদহ স্কুল সার্ভিস কমিশনের প্রাক্তন সদস্য সাদিকুল ইসলাম। তাঁর অঙ্গুলিহেলন ছাড়া একজন প্রার্থীও উত্তরবঙ্গের স্কুলে চাকরির ছাড়পত্র পেতেন না। মালদহের ইংরেজবাজারের তাঁর বাড়ির সামনে মহিলা চাকরি প্রার্থীরা এবং তাদের অভিভাবকরা কড়জোড়ে দাঁড়িয়ে থাকতেন তার কৃপাদৃষ্টির জন্য। কোচবিহার থেকে মালদা পর্যন্ত স্কুল শিক্ষকদের চাকরির নিয়োগে তিনিই ছিলেন শেষকথা। মালদহ কলেজের একজন রাষ্ট্রবিজ্ঞানের শিক্ষক হওয়া সত্ত্বেও উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল, কোর্ট বা ইউজি কাউন্সিলের শেষকথা ছিলেন তিনি। সিপিআইএম-এর সর্বগ্রাসী ও সর্বভুক রাজনীতির এক জীবন্ত প্রতিমূর্তি ছিলেন তিনি। এহেন শিক্ষাক্ষেত্রের নিয়ন্ত্রক সেই সম্রাটের শেষ পরিণতি ছিল অত্যন্ত বিয়োগান্তক। একই ব্যক্তি বিভিন্ন শিক্ষা কমিটিতে, কলেজ সার্ভিস কমিশন থেকে শুরু করে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়োগ কমিটিতে ঘুরে ফিরে উপস্থিত থাকা আর সেই উপস্থিতির কথা আগাম জানান দিয়ে প্রার্থীদের কাছ থেকে টাকা পয়সা, ভোগবিলাসের উপকরণ ক্রয় করা কিংবা শ্যালিকার বিবাহের খরচ তুলে নেওয়া, বিদেশ ভ্রমণের টাকা আদায় করার বিনিময়ে পিএইচডি দিয়ে দেওয়া বা বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকরির ব্যবস্থা করার হীন কাজের পরিণতি খুব মারাত্মক হতে বাধ্য। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য থেকে শুরু করে অধ্যাপকদের একাংশ নানা ধরনের বেআইনি, নীতিবিগর্হিত ও আর্থিক কেলেঙ্কারির সঙ্গে যুক্ত। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষককুল ভুলে গিয়েছেন যে তাদের মূল কাজ ক্লাসে পাঠদান। ক্লাসে পড়ানোর উপরেই তাদের সর্বাঙ্গীণ মনোযোগ থাকার কথা, অথচ পড়ানো বাদ দিয়ে বেশিরভাগ অধ্যাপক এখন পিএইচডি করানোতেই মত্ত হয়ে উঠেছেন। এটা ঠিক যে আমাদের দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো গবেষণা কেন্দ্র হিসেবে নির্ধারিত। কিন্তু গবেষণার নাম করে কিংবা পিএইচডির নাম করে যে অরাজকতা, নীতিহীনতা, অনৈতিকতা এবং আর্থিক লেনদেন চলছে সে সম্পর্কে রাশ টানবার প্রয়োজন আছে। জওহরলাল ন্যাশনাল ইউনিভারসিটির ইতিহাসের অধ্যাপিকা তনুকা সরকার এক প্রবন্ধে তাঁরই এক সহকর্মী মাঙ্গলিকের প্রসঙ্গে জানিয়েছেন যে ক্লাসে ভালো ভাবে পড়ানোর জন্য তিনি কখনোই গবেষণার জগতে পৌঁছাননি। মাঙ্গলিক মনে করতেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের প্রথম, প্রধান এবং শেষ কাজ শিক্ষাদান। শিক্ষাদানে সামান্য গাফিলতি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে ধ্বংসের মুখে নিয়ে যায়। আর এখন তো কলেজ স্তরের শিক্ষাদান পঠনপাঠন সামগ্রিকভাবে চুলায় নিক্ষিপ্ত হয়েছে। ২৫-৩০ বছরের তথাকথিত বামপন্থীদের কালাপাহাড়ি শিক্ষানীতি এবং উচ্চশিক্ষায় পদে পদে অন্তর্ঘাত চালানো সর্বোপরি বিশ্ববিদ্যালয়ের পদাধিকারিদের পণ্যের মতো ব্যবহার করার মতো নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা গোটা বিশ্ববিদ্যালয়কে ফোঁপরা করে দিয়েছে।

কলেজগুলোতে টুকলির এতটা বাড়বাড়ন্ত সমস্ত অভিভাবক এবং শিক্ষানুরাগীদের চরম লজ্জায় ফেলে দিয়েছে। মালদহের চাঁচল, কালিয়াচক, হরিশ্চন্দ্রপুর, সামসি, গাজোল, পাকুয়াহাট প্রভৃতি কলেজে টুকলি চলে। পরীক্ষার সময় গুন্ডাবদমাইশ, লুম্পেন, চোরডাকাত, সমাজবিরোধী দুস্কৃতীরা গোটা পরীক্ষা হলের দখল নিয়ে নিচ্ছে। গোছা গোছা টুকলির কাগজ নিয়ে পরীক্ষা সাঙ্গ হচ্ছে। গৌড় বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় এবং রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয় টুকলির জন্য গোটা দেশেই কুখ্যাতি অর্জন করেছে। অথচ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, রেজিষ্ট্রার, কন্ট্রোলার অব এক্সাম, ইন্সপেক্টর অব কলেজেস প্রমুখ পদাধিকারী টুকলির প্রতি সীমাহীন উদাসীনতা এবং প্রত্যক্ষে এবং পরোক্ষে প্রশয় দিয়ে চলেছেন। এই দুটো বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতক স্তরের পরীক্ষায় টুকলি এক প্রাতিষ্ঠানিক চেহারা নিয়েছে। গোটা পরীক্ষা ব্যবস্থাটা চরম ভাবে বেআব্রু হয়ে গিয়েছে। টুকলির এই সুতীব্র স্রোতে গোটা পরীক্ষাটা ভেসে গিয়েছে তাই নয়, উপাচার্য, আইসি, রেজিষ্ট্রার, ইন্সপেক্টর অব কলেজেস্ এইসব পদের যৌক্তিকতা নিয়েও প্রশ্ন উঠে যায়। এক একটা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যকে পুষতে সরকারের খরচ হয় ১০-১২ লক্ষ টাকা। ধরে নেওয়া হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কাস্টোডিয়ান হলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য।

গৌড় বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় ও রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক স্তরের টুকলি আটকানোর কোনো চেষ্টা এই সব কাস্টোডেয়ানদের নেই। আরও বিস্ময়ের কথা, টুকলির ফলে গোটা পরীক্ষা ব্যবস্থাটা প্রহসনে পরিণত হয়ে গেলেও গণমাধ্যমে এই বিষয়ে টুঁ শব্দটিও নেই। সম্প্রতি নোবেল লরিয়েট অমর্ত্য সেন 'জয় শ্রীরাম' ধ্বনি সম্পর্কে বেশ কিছু মন্তব্য করেছেন। তার কথার বিশ্বব্যাপী প্রতিক্রিয়া আমরা সকলেই জানি। কিন্তু মালদহের কালিয়াচক থেকে শুরু করে ইসলামপুর গোয়ালপোখর প্রভৃতি অঞ্চলের অপরাধ প্রবণতা বিশেষ করে জালনোটের কারবার ও স্নাতক পরীক্ষার টুকলি বিষয়ে তার সুচিন্তিত অভিমত থাকলে টুকলির বাড়বাড়ন্ত হয়তো কিছুটা কমত। কিন্তু তিনি এবিষয়ে মৌনীবাবা। অমর্ত্য সেনের প্রসঙ্গের অবতারণা এই কারণেই যে, শিক্ষা বিষয় ছাড়া অন্যান্য বিষয়ে তাঁর মুখ নিঃসৃত বাণী আজকাল বেশি শোনা যাচ্ছে। গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে কলেজগুলোতে টুকলির স্রোত চললেও গণমাধ্যম এবং কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরাও তাঁর মতোই একই ভাবে নীরব।

লক্ষণীয়, রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ের খোদ উপাচার্যের পিএইচডি করাবার ব্যাপারে রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো শিক্ষক কিন্তু মুখ খোলেনি। মুখ খুলেছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরা। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতরে বা কলেজগুলোর অভ্যন্তরে অরাজকতা, বহিরাগতদের নিয়ে কিংবা টুকলির স্রোত নিয়ে কেউ কোনো কথা বলেন না। পিএইচডি সংক্রান্ত বেআইনি কাজের ব্যাপারেও শিক্ষকরা নীরব থাকছেন। শিক্ষক সমাজই যদি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অভ্যন্তরের অনিয়ম, দুর্নীতি নিয়ে মুখ না খোলেন তাহলে সাংবাদিক কিংবা মন্ত্রীরা সংবাদমাধ্যমে বিবৃতি দিয়ে অরাজকতা কতটা দুর করতে পারবেন? রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য-সহ শিক্ষক অশোকবাবুর এহেন কার্যকলাপ বিশ্ববিদ্যালয়ের সমগ্র উপাচার্য সমাজকেই অত্যন্ত ছোটো ও হেয় করেছে। কিন্তু এই পরিস্থিতির উদ্ভব হতো না যদি উপাচার্য কিংবা এই শিক্ষকরা পড়ানোর কাজে নিজেকে নিয়োজিত করতেন। কিন্তু গোড়ায় গলদ। এই রাজ্যের শিক্ষক সমাজ পড়ানো ভুলে গিয়েছে। রাজনৈতিক নেতা, দুষ্কৃতী, প্রভাবশালী লোকজন, উপাচার্য এবং শিক্ষকরা এক অশুভ আতাঁত গড়ে তুলেছেন। যে কারণে প্রাথমিক স্কুল থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত প্রায় সর্বস্তর থেকে প্রকৃত শিক্ষা পলায়ন করেছে। ■

‘নিঃস্ব’ মমতার ‘ফিরিয়ে দাও’ আকুতি নিজস্ব ভুলেরই স্বীকৃতি

সুজিত রায়

ছবি বিশ্বাস অভিনীত ‘সবার ওপরে’ চলচ্চিত্রের সেই দৃশ্যটির কথা স্মরণ করুন। আদালতে নির্দোষ প্রমাণিত হয়েছেন। মুক্তি পেয়েছেন টানা ১৪ বছর জেলবাসের পর। কিন্তু সে মুক্তি আনন্দ এনে দেয়নি। দু’ চোখে অশ্রুধারা বইছে তাঁর। আর দু’ হাতের তালুতে পেতে ভিক্ষে চাইছেন আদালতের কাছে— “দাও দাও! ফিরিয়ে দাও আমার জীবনের ১৪টা বছর। ফিরিয়ে দাও। ফিরিয়ে দাও।”

পরিপ্রেক্ষিতটা পৃথক। তবু যেন অনেক বছর পরে গত ২১ জুলাই শহিদ দিবসের মঞ্চে মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কণ্ঠে শোনা গেল সেই একই আকুতি— ‘ফিরিয়ে দাও। ফিরিয়ে দাও! ফিরিয়ে দাও!’ যদিও তিনি ফেরাতে বলেছেন ‘১৫ লক্ষ টাকা ব্ল্যাকমানি’, কিন্তু সেদিনের সভায় উপস্থিত সমঝদার জনগণ ঠিকই বুঝেছেন— আসলে তিনি ফেরাতে চেয়েছেন, নিজের ভুলে গত আট বছর ধরে যা যা তিনি হারিয়েছেন। সেগুলি কী? সেগুলি হলো : নিজের সততার প্রতিমূর্তির ইমেজ। নিজের হাতেই উপড়ে ফেলা দলীয় শৃঙ্খলা। নিজের হাতে রোপণ করা দুর্নীতির বাসা। আর প্রায় হারাতে বসা রাজ্যপাট। কারণ ২০১৯-এর লোকসভা ভোটের ফলাফলে মমতা রাজনৈতিক নির্ভরতা এবং বিশ্বাসযোগ্যতা যখন প্রায় তলানিতে এসে পৌঁছেছে, তখন তিনি নিজের দলীয় কর্মীদের ‘কাটমানি’ দুর্নীতিতে অভিযুক্ত করে নিজেই ফেঁসে গিয়েছেন। বুঝে গেছেন, দাবার চালটা ভুল হয়ে গেছে। তাই কাটমানি ইস্যুর অভিমুখ ঘোরাতে ব্ল্যাকমানি ফেরতের দাবি, যে ব্ল্যাকমানি নিয়ে বিরোধীরা ভোটের আগেই জলঘোলা করার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছে। দেশব্যাপী বিরোধীরা ব্ল্যাকমানি ইস্যুতে নির্বাক হয়ে গেলেও, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় স্রেফ নিজেকে বাঁচানোর তাগিদেই জেলায় জেলায় বিক্ষোভ কর্মসূচির কথাও ঘোষণা করে দিয়েছেন হাস্যকর ভাবে। বুদ্ধিটা প্রশান্ত কিশোরের কিনা তা জানা যায়নি। তবে এটা বলা যেতেই পারে— যদি এই পরামর্শটা প্রশান্ত কিশোরের হয় তাহলে তিনি নির্ঘাত মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে বাঁচাতে আসেননি। ৫০০ কোটি টাকা পকেটস্থ করে ডোবাতেই এসেছেন। ব্ল্যাকমানির প্রসঙ্গ তুলে কাটমানির প্রসঙ্গকে যে কোনোভাবেই ধামাচাপা দেওয়া যাবে না, তা মমতা না বুঝলেও রাজ্যবাসী বোঝেন, কারণ তাঁরাই প্রত্যক্ষ ভুক্তভোগী। সেই তাঁরাই যখন কাটমানি ফেরতের দাবিতে গ্রামে গ্রামে দাবি তুলছেন তখন ২১ জুলাইয়ের মঞ্চে মমতা সাফাই গাইছেন— ‘সরকারের নানা প্রকল্পের ছোটো ছোটো কাজগুলোর সুবিধা যাতে মানুষ পায়, তার জন্য বলেছিলাম, দেখবেন কেউ যেন ভাগ (কাটমানি) না বসায়। একটা মহৎ উদ্দেশ্যে বলেছিলাম। আর সেটাকে বিকৃত করে বিজেপি নেতারা বাড়ি বাড়ি গিয়ে বলছেন, টাকা ফিরিয়ে দাও।’ ধর্মতলার ছড়ানো ছেটানো হাল্কা মনোভাবের ভিড়ের চেহারা স্পষ্ট করে দিয়েছে মমতার বক্তব্য মানুষ গ্রহণ করেননি। ফলে



মমতার বক্তব্য চলাকালীনই যখন মানুষ পা বাড়িয়েছেন চিড়িয়াখানা নয়তো বাড়ির পথে, তখন মাইকে মিথ্যে প্রচার করতে হয়েছে যে চিড়িয়াখানা খুলবে দেরিতে। এমনকী মঞ্চে দাঁড়িয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে বার বার বলতে হয়েছে— ‘রেড রোডে মানুষের ভিড় দেখে মনে হচ্ছিল যেন একটা ব্রিগেডের সভা হচ্ছে।’ আসলে ওই ভিড়টা ছিল চিড়িয়াখানা অভিমুখী।

মমতা অভিযোগ করেছেন উজালা গ্যাস নিয়ে নাকি এরাজ্যে বিজেপি কাটমানি নিয়েছে। এল পি জি, পেট্রোল পাম্প নিয়ে কাটমানি তোলা হয়েছে। জুজুর ভয় দেখিয়েছেন— ‘কি দেব নাকি সব তথ্য বের করে!’ বার কিন্তু করেননি। মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দিচ্ছেন কেন--- এ প্রশ্ন উঠেছে সেদিন জনসমাবেশেই।

দলত্যাগের হিড়িকেও রীতিমতো তটস্থ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, সেটাও তাঁর বক্তব্যে পরিষ্কার। আরও পরিষ্কার, তিনি আর ই ডি-র জোরালো পদক্ষেপেও ভয় পাচ্ছেন, হয়তো নিজেও গ্রেপ্তার হয়ে যাবেন এবার। তাই ভয় কাটাতে হুংকার দিয়েছেন— ‘তিল তিল করে তৃণমূল গড়েছি। আমাকে ইডি বা সিবিআই অ্যারেস্ট করলেও তৃণমূল ছেড়ে কোথাও যাব না।’

আসল কথা হলো— ২১ জুলাইয়ের মঞ্চ থেকে তৃণমূল নেত্রীর বক্তব্যে একটা কথা বেশ স্পষ্ট হয়ে গেল— ২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচনের ফলাফল দেখে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বুক ধড়পড়ানি শুরু হয়ে গেছে। ফলে মুখে যতই বলুন না কেন— ‘ইঞ্চিতে ইঞ্চিতে বুঝে নেব’, আসলে তিনি নিজস্ব রাজনৈতিক বিচারবোধ হারিয়ে ফেলছেন দ্রুত। যা বলছেন সবই বুমেরাং হয়ে যাচ্ছে দেখে সংশোধন করার চেষ্টা করছেন। কিন্তু সংশোধনীটাও জনগণ খাচ্ছেন না। সেটাও বুমেরাং হয়ে যাচ্ছে। ফলত মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এখন ডুবে রয়েছেন এক কোমর পাঁকে। ভুল রাজনীতির পাঁক। অতি উচ্চাশার পাঁক। দেশবিরোধী রাজনৈতিক পদক্ষেপের পাঁক। নিজস্ব পরিবারের প্রকাশ্য অবক্ষয়ের পাঁক। আর পাপ। নিজস্ব কর্মীদের ওপর বিশ্বাস হারানোর পাপ। জনগণের ওপর নির্ভরতা হারানোর পাপ। ঘন ঘন মিথ্যা দিয়ে সত্যকে ঢাকার অপচেষ্টার পাপ।

রাজ্য-রাজনীতির হালচাল নিয়ে চর্চাকারীরা ২১ জুলাইয়ের আগেই সোশ্যাল মিডিয়ায় দেওয়ালে দেওয়ালে ভবিষ্যদ্‌বাণী করেছিলেন— মমতা ভুল বকবেন এবং প্রশান্ত কিশোরের মতামতকে গুরুত্ব দেবেন না। একজন তো প্রকাশ্যে লিখেছিলেন— ‘উনি কি কারও কথা শোনেন যে প্রশান্ত কিশোরের কথা শুনবেন?’ ২১ জুলাইয়ে মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। রাজ্যবাসীর ওপর, দলীয় কর্মীদের ওপর, নেতৃবৃন্দের ওপর, প্রশাসনের ওপর, পুলিশের ওপর, বিরোধীদের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে এবং উপুর্যুপরি বেআইনিভাবে কেন্দ্রের সঙ্গে সংঘাতে গিয়ে তিনি নিজস্ব মস্তিষ্কের ওপরই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলছেন। পরবর্তী রাজ্য বিধানসভার নির্বাচন যত এগিয়ে আসবে, ততই এই নিয়ন্ত্রণের রাশ ক্রমশ কমতে থাকবে। দলের নেতা-নেত্রীরা তা বুঝে গেছেন। ফলে গেরুয়া শিবিরের দিকে পা বাড়িয়ে বসে সবাই। ছোটো নেতা, মেজো নেতা,বড়ো নেতা— সকলেই। এখন বিজেপির ওপর নির্ভর করবে ডুবন্ত জাহাজের ইঁদুর বাহিনীর কতটা অংশ ঠাঁই পাবে গেরুয়া শিবিরে।

পুরসভার ভোটকে পাখির চোখ করে ঝাঁপাতে হবে এখনই

পার্থসারথি গুহ

ভারতের প্রথম রাজধানী শহর কলকাতার মর্যাদা এখনও অটুট অনেকক্ষেত্রেই। কলকাতা পুরসভাও ঐতিহাসিকভাবে বেশ সমৃদ্ধ। আর আগামী ১০ মাসের মধ্যেই কলকাতা-সহ রাজ্যের ১০০টি পুরসভার নির্বাচন। এর মধ্যে কলকাতা পুরসভা জয়ের ওজন নিশ্চিতভাবে জাতীয় রাজনীতিতে মাইলেজ দেবে পদ্ম শিবিরকে। ১৮ জন সাংসদ পাওয়ার পর ১৮০ জন বিধায়ক (যদিও সরকার গঠনে প্রয়োজন ১৪৮ বিধায়ক) পাওয়ার স্বপ্ন দেখতেই পারে বিজেপি। আর এই স্বপ্নকে বাস্তব আকার দিতে তাই কলকাতা পুরসভা-সহ যেসব পুরসভায় নির্বাচন হবে তা জয়ের রূপরেখা তৈরি করতে হবে এখনই। ঘরে বসে নয়, নির্দিষ্ট পথে এগোতে সর্বাগ্রে দরকার নিশ্ছিদ্র সংগঠন। কলকাতা পুরসভার ১৪৪টি আসনের মধ্যে ১০০টি আসনে জয় পাওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনাও রয়েছে বিজেপির। যদিও লোকসভার ফল ধরলে প্রায় ৬৫টি পুর কেন্দ্রে এগিয়ে ছিল বিজেপি। এর মধ্যে কলকাতা পুরসভার অনেক দাপুটে মেয়র পারিষদও ধরাশায়ী হয়েছে বিজেপির কাছে। স্বয়ং মেয়র ফিরহাদ হাকিমও জিতেছেন কান ঘেষে। এমতাবস্থায় রাজ্যে তৃণমূল বিরোধী মনোভাব বিগত দু'মাসে আরও অনেকটাই বেড়েছে। ফলে ৬০-৬৫টি পুর আসনের লিড দু'অঙ্কে পৌঁছতে যে সময় নেবে না তা বলাবাহুল্য। কিন্তু এই সংখ্যাটা তখনই সত্যতা পাবে যখন বিজেপি কর্মীরা বুথ স্তর থেকে তৃণমূলের সন্ত্রাস ও রিগিং রুখে দিতে পারবে। একটা কথা এখন থেকেই মাথায় ঢুকিয়ে নিতে হবে কলকাতা পুরসভায় যাদবপুর, বেহালা-সহ একটা বড়ো সংখ্যক অ্যাডেড এরিয়া রয়েছে। আর তৃণমূল ঠিক তার পূর্বসূরি বামেদের বিদ্যা ধার করে এসব এলাকায় ভোট লুঠের চেষ্টা চালাবে।

গতবার এইসব এলাকায় ভোটার কার্ড কেড়ে নিয়ে ভোটাধিকার প্রয়োগ না করতে দেওয়ার এক নোংরা খেলা চালানো হয়েছিল। অনেকটা পঞ্চায়েত ভোটের মতো গণতন্ত্রকে হত্যা করার ব্যবস্থা। সুতরাং এখন থেকেই



সঙ্ঘবদ্ধভাবে নিজ নিজ পুর এলাকায় গণতন্ত্রের দুর্গ গড়তে হবে সাধারণ মানুষকে সঙ্গে নিয়ে।

সাফল্য শব্দটা শুনতে যতটা ভালো লাগে ততটাই চাপও তৈরি করে সফলতা অর্জনকারীর কাছে। কয়েকদিনের মধ্যেই সাফল্যের উদ্ভাসিত ঘোর কাটলে বোঝা যায় কত বড়ো বোঝা চাপল নিজেদের ওপর। আর তখনই শুরু হয় এই সাফল্য আগলে রাখার লড়াই। গত লোকসভা নির্বাচনে সারা দেশের মানুষ দু'হাত ভরে ভোট দিয়েছেন বিজেপিকে। আস্থা রেখেছেন নরেন্দ্রভাই দামোদরদাস মোদীর ওপর। প্রত্যাবর্তন ঘটেছে এনডিএ সরকারের। এই নির্বাচন দেখিয়ে দিয়েছে হাজারো অপপ্রচার, কুৎসা সত্ত্বেও কীভাবে দেশের নানা প্রান্তে পদ্ম ঝড় উঠেছে। উত্তর, দক্ষিণ, পশ্চিম বা উত্তর-পূর্ব ভারতের মতো দেশের পূর্বে প্রান্তেও বিজেপি ঝড় কোনও অংশে কম ছিল না। ব্যতিক্রম থাকেনি পশ্চিমবঙ্গও। ৪২-এ ৪২ পাওয়ার শাসক দলের আস্ফালনকে চূর্ণবিচূর্ণ করে ১৮টি আসন এই রাজ্য থেকে জিতে বিজেপি বুঝিয়ে দিয়েছে তারা হাওয়ায় ভেসে রাজনীতি করে না। দলের সর্বভারতীয় সভাপতি অমিত শাহজী যে ২৩টি আসনের লক্ষ্যমাত্রার কথা বলেছিলেন তা প্রায় ফলপ্রসূ গিয়েছে। অন্তত আরও ৭-৮টি কেন্দ্রে শাসক দলের সন্ত্রাস ও জুলুমের কাছে হার মানতে হয়েছে গণতন্ত্রকে। না হলে ২৫-এর বেশি সাংসদ এ রাজ্য থেকে পাঠাতে পারত বিজেপি।

যাইহোক ১৮ সংখ্যাটাও কোনও অংশে কম নয়। আঠেরোর টগবগে শক্তি নিয়ে এখন বাকি কাজ সম্পূর্ণ করার পালা। বাকি কাজ বলতে যে রাজ্যের এই অপদার্থ সরকারকে হটিয়ে পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি সরকার প্রতিষ্ঠা করা সেটা সবাই জানেন। লোকসভা ভোটের বিরাট সাফল্যকে সেমিফাইনাল বলছেন রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা। তাঁরা বলছেন সেমিফাইনালে বিজেপি নিশ্চিতভাবে লেটার মার্কস পেয়েছে। এখন অগ্নিপরীক্ষা হতে চলেছে আগামী ২০২১-এর বিধানসভা ভোট। সেমিফাইনালের সাফল্যের পর এখন ফাইনাল পর্যায় হলো বিধানসভা ভোট। স্টেজ রিহার্সালের মার মার কাট কাট সাফল্য যাতে মূল পর্বেও ধরে রাখা যায় তার জন্য এখন থেকেই আদা জল খেয়ে নেমে পড়তে হবে রাজ্য বিজেপিকে। সুখের কথা বিজেপি রাজ্য নেতৃত্ব এখন জেলায় জেলায় লড়াই করে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করার আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। কেন্দ্রীয় নেতৃত্বও অভিভাবকের মতো আগলে রাখার চেষ্টা করছে রাজ্য বিজেপিকে। তা সত্ত্বেও সময়ের দাবি মেনে রাজ্য বিজেপিকে সংগঠন মজবুত করায় আরও মনোনিবেশ করতে হবে এটা বলাইবাহুল্য। আবেগ নয় অঙ্ককে হাতিয়ার করে এগোতে হবে। মনে রাখতে হবে লোকসভার সাফল্য এখন অতীত। অর্থাৎ শুরু করতে হবে শূন্য থেকে।

আগামী বছর কলকাতা-সহ রাজ্যের ১০০টি পুরসভায় নির্বাচন হওয়ার কথা। যদিও এর মধ্যে একটা কথা চাউর হতে শুরু করেছে রাজ্য রাজনীতির আকাশে বাতাসে। তা হলো তৃণমূল যদি দেখে পুরভোটেও তাদের প্যাপক ভরাডুবি ঘটতে চলেছে, তবে সেক্ষেত্রে প্রশাসক বসিয়ে বিধানসভা ভোট পর্যন্ত উতরে দেওয়ার অপচেষ্টা চালাতে পারে তৃণমূল। কিন্তু আপাতত সেই চিন্তায় ভাবান্বিত না হয়ে বুথ ভিত্তিক শক্তিশালী সংগঠন গড়ে তোলার কাজ চালাতে হবে পুরোদমে। যাতে তৃণমূল আর কোনওভাবেই মাথা তুলে দাঁড়াতে না পারে। এমনিতেই কাটমানির ক্যান্সার ঘাসফুলের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ছড়িয়ে বিষাক্ত করে তুলেছে আপাদমস্তক। এরপর পুরভোটের পরাজয় তৃণমূলের কফিনে শেষ পেরেকটা ঠুকে দেওয়ার কাজ করবে জোরকদমে। ▮

পশ্চিমবঙ্গের শিল্পক্ষেত্রে দূষণ সংক্রান্ত অডিট রিপোর্ট নিশ্চিতভাবে এক অশনি সংকেত

বিশেষ সংবাদদাতা

পরিবেশ দূষণ আজ সারা পৃথিবীকে মহা দুশ্চিন্তায় ফেলেছে। ভারতের জাতীয় রাজধানী দিল্লি পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি দূষণযুক্ত শহরের তকমা পেয়েছে। দিল্লির পরেই নাকি কলকাতা শহরের বাতাসে বিষের পরিমাণ সর্বাধিক। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ২০১২ সালের তথ্যানুযায়ী, সারা পৃথিবীতে ২৩ শতাংশ মৃত্যুর কারণ পরিবেশ দূষণ। পশ্চিমবঙ্গে দ্রুতগতিতে শিল্পবিকাশের ফলে পরিবেশের ওপর নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে। পশ্চিমবঙ্গে এমন বেশ কিছু শিল্প কারখানা রয়েছে যা বেশি মাত্রায় দূষণ ছড়াচ্ছে। কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ এই রাজ্যের হলদিয়া, হাওড়া ও আসানসোলকে মারাত্মক দূষণযুক্ত অঞ্চল এবং দুর্গাপুরকে উচ্চ মাত্রায় দূষণযুক্ত অঞ্চল হিসেবে চিহ্নিত করেছে। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রক ২০১২ সালে সংসদে যে রিপোর্ট পেশ করেছে, তাতে দেখা গিয়েছে যে পশ্চিমবঙ্গে সর্বাধিক সংখ্যায় ১২,৮১০টি দূষণ সৃষ্টিকারী (রেড ক্যাটাগরি) শিল্পক্ষেত্র রয়েছে। শিল্প স্থাপনের ক্ষেত্রে পরিবেশ সংক্রান্ত আইন রূপায়ণ-সহ দূষণ নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব পশ্চিমবঙ্গ দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের ওপর বর্তায়। এই বিষয়গুলি মাথায় রেখে শিল্পক্ষেত্রের দূষণ নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গ দূষণ পর্ষদের গৃহীত বিভিন্ন উদ্যোগ খতিয়ে দেখে অডিট রিপোর্ট তৈরি করা হয়েছে। ২০১২-১৩ থেকে ২০১৬-১৭ সময়কালে 'স্টেট এনভায়রনমেন্ট ইম্প্যাক্ট অ্যাসেসমেন্ট অথরিটি (এস ই আই এ এ)'-র পক্ষ থেকে ছাড়পত্র পাওয়া ৬৪টি রেড ক্যাটাগরি শিল্পের অডিট করা হয়। এছাড়া, আরও ৫১টি রেড ক্যাটাগরি শিল্পের দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও নজরদারি ব্যবস্থা পরিদর্শন করা হয়।

অডিটে দেখা গেছে কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ ও পশ্চিমবঙ্গ দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের তথ্যে অমিল রয়েছে। ২০১৩-র জানুয়ারি মাসে ৬,১৩৫টি শিল্পকে দূষণ সৃষ্টিকারী শিল্প হিসেবে পশ্চিমবঙ্গের দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ চিহ্নিত করে। এর মধ্যে ৩,৫০০টি শিল্প ইউনিট পরিদর্শন করা হয়। কিন্তু, ২০১৭-র জুন মাসের হিসাব অনুযায়ী ৯৫২টি শিল্প ইউনিট পরিদর্শন করা হয় এবং ২,৫৪৮টি শিল্প ইউনিট পরিদর্শন করা হয়নি। ২০১৩-১৪ থেকে ২০১৫-১৬ সময়কালের কোনো কর্মপরিকল্পনা ২০১৭-র জুলাই মাস পর্যন্ত রচিত হয়নি। এমনকী ২০১৬-১৭ সময়কালের জন্যও রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের কোনো কর্মপরিকল্পনা রচিত হয়নি। দূষণ নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে প্রথম পদক্ষেপ হলো রাজ্যের বিভিন্ন স্থানের দূষণ মাত্রার নিরিখে মানচিত্র তৈরি করা। কলকাতা পুর অঞ্চল এবং দুর্গাপুর, আসানসোল ও হলদিয়ার মতো উচ্চমাত্রায় দুষিত স্থানেও অতিরিক্ত দূষণ সৃষ্টিকারী শিল্প গড়ে ওঠায় শিল্প স্থাপনের নীতি লঙ্ঘন করা হয়েছে। এছাড়া, পরিবেশগত দিক থেকে যেসব স্পর্শকাতর এলাকা রয়েছে, সেই স্থানগুলিকে শিল্প স্থাপনের আওতা থেকে বাদ রাখা হয়নি। ২০১৫ সালের মে মাসে ১৭০টি রেড ক্যাটাগরি শিল্পকে মহেশতলায় স্থানান্তরিত করার জন্য চিহ্নিত করা হয়। কিন্তু দু'বছর পরেও তা কার্যকর হয়নি। ২০০৯ এবং ২০১৬ সালে কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ, রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদকে পরিবেশ সংক্রান্ত আইন লঙ্ঘনের জন্য নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করার নির্দেশ দেয়। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ তা করেনি। ২০১২-১৩ ও ২০১৩-১৪ সালে বিশেষজ্ঞ নিয়োগ করে পরিশ্রুত প্রযুক্তির প্রসার সম্বন্ধীয় রিপোর্ট তৈরি করা হয়েছিল। এজন্য ৯৬ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়, কিন্তু এটি এখনও রূপায়িত হয়নি।

এইইআইএএ কাজকর্মে পদ্ধতিগত গাফিলতি থাকার কারণে 'বি' শ্রেণীর শিল্পগুলির পরিবেশগত ছাড়পত্র পেতে অসুবিধা হয়। ৩৮ শতাংশ ক্ষেত্রে পরিবেশগত ছাড়পত্র দেওয়ার সময় নিয়ম লঙ্ঘিত হয়েছে বলে অডিট রিপোর্টে প্রকাশ পেয়েছে। ছ'টি খনির ক্ষেত্রে ২০১৫-র মার্চ থেকে ২০১৬-র জুলাই পর্যন্ত সময়ের জন্য এসইআইএএ পরিবেশগত ছাড়পত্র দিয়েছে, কিন্তু ওই সময়কালে খনিগুলির লিজ শেষ হয়ে যায়। পশ্চিমবঙ্গ দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের জানা ছিল না যে এমন বেশ কয়েকটি শিল্প আছে যারা শিল্প স্থাপনের ছাড়পত্র ছাড়াই পরিবেশগত ছাড়পত্র পেয়েছে। এর কারণ কোনো কেন্দ্রীয় তথ্যভাণ্ডার তাদের কাছে নেই।

২০১৭-র জুলাই মাসের তথ্য অনুযায়ী, ৫,৪৫২টি রেড ক্যাটাগরির শিল্পের মধ্যে এই রাজ্যে কেবল ১,৯০৮টি শিল্পের কাছে যথাযথ ছাড়পত্র রয়েছে। অন্যদিকে, ২৭৯৭ টি শিল্পের এই ধরনের ছাড়পত্রের মেয়াদ ইতিমধ্যেই উত্তীর্ণ হয়ে গেছে।

তিনটি অতিরিক্ত মাত্রায় দূষিত অঞ্চল—হলদিয়া, হাওড়া ও আসানসোলে দূষণ নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত কর্মপরিকল্পনা রূপায়ণ করা হয়নি। অতিমাত্রায় দূষিত অঞ্চল দুর্গাপুরের জন্য কোনো কর্মপরিকল্পনা এখনও তৈরি হয়নি। তাছাড়া, এইসব অতিরিক্ত দূষিত এলাকাগুলিতে কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের নীতি-নির্দেশিকা অনুযায়ী বায়ু ও জলের মান নির্ণয় সংক্রান্ত কেন্দ্র স্থাপন করা হয়নি। হাওড়া, আসানসোল ও দুর্গাপুরে বায়ু দূষণের মাত্রা স্বাভাবিকের তুলনায় অনেকটাই বেশি বলে ধরা পড়েছে।

৬৪টি শিল্প যেগুলি ২০১২-১৭-র মধ্যে এসইআইএএ-এর কাছ থেকে পরিবেশ ছাড়পত্র পেয়েছে তারা কেউই মান্যতা সংক্রান্ত রিপোর্ট জমা দেয়নি। ২০১৬ সালের এপ্রিল মাসে কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ ছ'টি বাতাসের মান নজরদারি ব্যবস্থা স্থাপনের অনুমোদন দিয়েছিল। পরবর্তীকালে ২০১৭-র ফেব্রুয়ারি মাসে তা মাত্র দুটিতে নামিয়ে আনা হয় যেহেতু পশ্চিমবঙ্গ দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ প্রয়োজনীয় জায়গার সংস্থান করতে পারেনি।

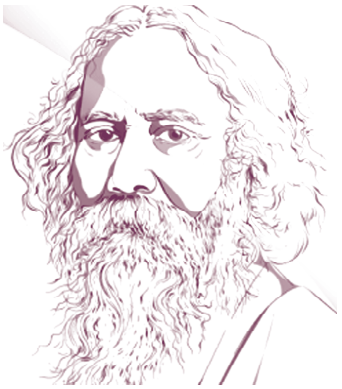
কবিগুরু অন্তিম যাত্রা জাতীয় গ্লানির দিন হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে

বেদ মোহন ঘোষ

বৃহস্পতিবার, ৭ আগস্ট, ১৯৪১ সাল। বারোটা দশ মিনিটে কবিগুরুর শেষ নিঃশ্বাস ক্রমে ক্রমে ধীর হতে হতে সম্পূর্ণ স্তব্ধ হয়ে গেল (নির্বাণ পৃ. ৪৬)। তিনি ছিলেন বিশ্বের কবি। সাধারণ মানুষের ধরাছোঁয়ার সংস্পর্শে ছিলেন না তিনি। যে সম্বন্ধে তিনি যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। তাঁর কাম্য ছিল তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর অন্তিম যাত্রা হবে নীরবে শ্রদ্ধাবান শোকযাত্রা। নয় কোনো শব্দমুখর শোভাযাত্রা। নয় কোনো আড়ম্বর। তিনি চাননি তাঁর আত্মাহীন অসহায় দেহ যেন বহু মানুষের হস্তস্পর্শে কলুষিত হয়। কিন্তু কী হয়েছিল সেইদিন? কেমন করে অন্তিম যাত্রা হয়েছিল সেই ঋষিকল্প মানুষটির মরদেহ?

কলকাতার রাজপথে সেদিন জনতার আচরণ সারা বিশ্বকে স্তম্ভিত করেছিল। দু'জন বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব তাদের প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনায় সেই বীভৎস আর কুৎসিত আচরণ নথিভুক্ত করে গেছেন। প্রথমজন তপন রায়চৌধুরী তাঁর বাঙালনামায় পৃষ্ঠা-৯৭ (অধ্যায়-গুরুকুলবাস-প্রথম পর্ব)-এ লিখছেন—''জোড়াসাঁকো গিয়ে এমন দ্বিধাহীন বর্বরতার দৃশ্য দেখতে হবে কখনও ভাবিনি। প্রচণ্ড চেঁচামেচি ঠেলাঠেলি চলছিল। জনতার চাপে ঠাকুরবাড়ির লোহার গেট ভেঙে গেল। মানুষের ভিড় এত বেশি যে, আমাদের পা প্রকৃতপক্ষে যেন মাটি ছুঁচ্ছিল না। এরই মধ্যে হঠাৎ প্রচণ্ড বেগে মানুষের মাথায় মাথায় উপর দিয়ে খাটের উপর শোয়ানো ওঁর দেহ বেরিয়ে এল (ভিড়ের চাপে খাট বের করবার সামান্যতম জায়গা ছিল না)। আর অনেক লোক ওঁর চুল দাড়ি ছিঁড়ে নিচ্ছিল। কবির দেবদেহ শুধু মুহূর্তের জন্য দেখতে পেলাম। বাইশে শ্রাবণ আমার কাছে শুধু জাতীয় শোকের দিন নয়, জাতীয় গ্লানির দিনও হয়ে আছে। এই বর্বরতার নায়করা যতদূর দেখতে পেলাম তথাকথিত ভদ্র বাঙ্গালি ছাড়া আর কেউ নয়।''

দ্বিতীয়জন সত্যজিৎ রায়-জায়া বিজয়া রায়



তাঁর 'আমাদের কথা' বইতে জীবন্তভাবে তুলে ধরেছেন এই ঘটনা। তিনি এই ষষ্ঠ অধ্যায়ের নামই দিয়েছেন 'আমার জীবনের এই অধ্যায়টা আমি ভুলতে চাই।' পৃষ্ঠা ৭০-এ তিনি লিখেছেন—''রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু এখন আমার চোখের সামনে ভাসে। যে মানুষটিকে পৃথিবীর সর্বকালের শ্রেষ্ঠ জিনিয়াস বলে অমি মনে করি, তিনি কিন্তু সাধারণ মানুষের ধরা ছোঁয়ার বাইরে ছিলেন। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর মরদেহটাকে নিয়ে যে তাণ্ডব নৃত্য হয়েছিল, সে কথা ভাবলে এখনও গা শিউরে ওঠে। এখন যেমন ট্রাকে করে বিখ্যাত ব্যক্তিদের মৃতদেহ নিয়ে যাওয়া হয়, তখনকার সময় তার চল ছিল না। শববাহীরা খাট বহন করে নিয়ে যেতেন, তার পরিণামটা যে কী ভয়ংকর হয়েছিল তা সকলেই জানেন। কাঁধের উপর খাট বহন করে যাচ্ছিলেন বহু বিশিষ্ট গণ্যমান্য ব্যক্তি। আর লক্ষ লক্ষ মানুষ তাদের ধরাছোঁয়ার মধ্যে দেহটাকে পেয়ে যা কাণ্ড করেছিল, ভাবতে এখনও আমার মাথা লজ্জায় নুয়ে আসে। হাত-পা ধরে টানা, দাড়ি ছেঁড়া, চুলছেঁড়া, শোকে যেন সবাই পাগল হয়ে গিয়েছিল। এরকম একজন মানুষের প্রতি কোথায় শ্রদ্ধা জানাবে, তা না করে এরকম নারকীয় বর্বরতা যেন কল্পনা করা যায় না। আমার চোখ দিয়ে ঝরঝর করে জল পড়ছিল। আর দেখতে পারলাম না। বললাম, এভাবে তো ওঁর দেহ শ্মশানে পৌঁছতেই পারবে না। পরে অবশ্য পুলিশের সাহায্যে দেহ অক্ষত অবস্থায় না হলেও শ্মশানে পৌঁছতে পেরেছিল।''

রবীন্দ্রনাথের শেষ যাত্রায় পুলিশের ডিউটিতে ছিলেন পুলিশ কমিশনার চার্লস টেগার্টের স্নেহভাজন বিশেষ পুলিশ অফিসার পঞ্চানন ঘোষাল। এই প্রসঙ্গে পঞ্চানন ঘোষাল সম্বন্ধে কিছু বিবরণ হয়তো অপ্রাসঙ্গিক হবে না। সামাজিক উপন্যাস লেখক এই পঞ্চানন ঘোষালকেই সাক্ষাতে কবিগুরু বলেছিলেন—''তুমি পুলিশে ঢুকেছ। ভারতীয় ক্রিমিনোলোজি বিষয় গবেষণা কর। এর বাংলা হবে অপরাধ বিজ্ঞান। আর যদি উপন্যাস লিখতে হয়, অপরাধীদের জীবন-চরিত্র ভিত্তিক ক্রাইম উপন্যাস লেখ।'' পঞ্চানন ঘোষাল সে উপদেশ অক্ষরে অক্ষরে মান্য করেছিলেন। তার লেখা 'পুলিশ কাহিনি— আমি যখন পুলিশ ছিলাম' ইত্যাদি গ্রন্থগুলি বাংলায় লেখা অপরাধ বিজ্ঞান চর্চার পথিকৃৎ বলা যেতে পারে। পঞ্চানন ঘোষাল পেশায় ছিলেন ব্রিটিশ পুলিশের অফিসার কিন্তু মনটি স্বদেশিয়ানায় পূর্ণ ছিল।

যদিও প্রত্যক্ষদর্শীদের বিবরণ অনুসারে জানা যায়, বেশ কিছু মানুষ কবির দাড়ি ও চুল ছিঁড়ে নিয়েছিল কিন্তু পঞ্চানন ঘোষাল রিপোর্টে জানালেন যে ঘটনাটি রটনামাত্র। মাত্র একজন যুবক ওইরকম বিভ্রান্তমূলক রটনার নায়ক। পরের অংশটুকু পঞ্চানন ঘোষালকেই উদ্ধৃত করা যাক। তিনি লিখলেন— 'ওই ছোকরার বাড়ি তল্লাশি করে ওগুলো আমরা সংগ্রহ করি। আসল না নকল বোঝা গেল না। ইংরাজ ডেপুটি সাহেবের নির্দেশে তা গঙ্গায় ফেলে দেওয়া হলো, নইলে ওগুলি আরও জাল হতো এবং ভবিষ্যতে কবির যা দাড়ি পাওয়া যেত তার ওজন হতো কয়েক টন' (আনন্দবাজার রবিবার ২০.৯.১৮)। কবিগুরুর ওই আসল অথবা নকল দাড়ি ও চুল সংগ্রহকারী যুবকের শেষ পর্যন্ত কোনো শাস্তি হয়েছিল কিনা অবশ্য জানা নেই। ■

চিঠিপত্র

অমর্ত্য সেনের নাম করে এত ফ্লেক্স, হোর্ডিং, কেন?

রায়গঞ্জ শহরের মূল সড়ক পথের ডিভাইডারের মাঝে মাঝে ফ্লেক্সের উপর কাঠের ফ্রেমে অমর্ত্য সেনের জয় শ্রীরাম স্লোগান সম্পর্কিত বিতর্কিত মন্তব্যের প্রেক্ষিতে আমি একজন সাধারণ নাগরিক হিসাবে কয়েকটি মতামত রাখছি। শহরের বুকে টাকা খরচ করে কে বা কারা এত ফ্লেক্স লাগিয়েছে, যাতে কোনো নাম, পরিচয় ও ঠিকানা নেই? রাম নাম করে বিভেদ সৃষ্টিকারী উস্কানিমূলক কোনো ব্যক্তি সমাজে গোলমাল লাগানোর গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হচ্ছে কিনা, একজন সাধারণ নাগরিকের মনে প্রশ্ন আসতেই পারে। কথাগুলি হতে পারে অমর্ত্য সেনের একান্ত ব্যক্তিগত, কিন্তু সমাজের বুকে সংস্কৃতির বিভাজন সৃষ্টি করার দুঃসাহসী প্রয়াস প্রকাশ্যে যারা করছেন তারা কারা?

বঙ্গের কোটি কোটি মানুষ রাম ও কৃষ্ণ নামে নিজেকে ভক্তি স্রোতে আজও ভাসিয়ে দেয়। তাতে অমর্ত্য সেনের ব্যক্তিগত মতের প্রচার করে লক্ষ লক্ষ মানুষের হৃদয় স্থলে যদি আঘাত আসে এবং প্রতিক্রিয়া শুরু হয় তার দায়ভার হোর্ডিং-এর প্রচারকারীরা বহন করবেন কি? সেন মহাশয় কি জানেন তাঁর একান্ত ব্যক্তিগত মতকে বিভেদকারীরা বাজারে ছেড়েছেন? সেন মহাশয়কে সমাজে বিভেদ সৃষ্টিকারীর নায়ক হিসাবে তুলে ধরতে তার কথাকে কিছু ব্যক্তি কি পণ্য হিসেবে ব্যবহার করেছেন না? শ্রীরাম ধ্বনিকে গালিগালাজ বলে যারা বাজার গরম করছে তারা আবার দুর্গা ও রামের সংস্কৃতি প্রসঙ্গে বিতর্কিত বক্তব্য বাজারে ছেড়ে হিন্দু সংস্কৃতির উপর অনেক সময় বিতর্কিত মন্তব্য ও আচরণ করে নিজেদের জাহির করার চেষ্টা করলেও তারা কালস্রোতে হারিয়ে গেছে। থেকে গেছে শ্রীরামচন্দ্রের 'জয় ঘোষ' যা সর্বকালে বর্তমান। যারা বিতর্কিত আচরণ করেছেন তাদের নিয়ে হিন্দু সমাজের কিছু যায় আসে না। ভয় সেই সমস্ত বিভেদকামী শক্তিকে যারা এই বিতর্কিত কথা বা আচরণগুলি সমাজের বুকে চাপিয়ে দেওয়ার মতো হোর্ডিং প্রচার করছে। এই কাজে টাকা আসে কোথা থেকে এবং কীভাবে সরকারি সম্পত্তির উপর হোর্ডিংগুলি লাগায়। রাম নবমী ও দুর্গাপূজা বাঙ্গলার তথা ভারতীয় সংস্কৃতির অন্তঃসম্পর্কে আবদ্ধ। এই সম্পর্ককে অপমান করে মানুষের মনে খোঁচা মারার আধিকার কারোর নেই। হোর্ডিং লাগিয়ে খুঁচিয়ে 'ঘা' করে দেওয়া মানুষগুলো সম্পর্কে সকলে সতর্ক থাকুন।

—কেশবানন্দ পাল,
রায়গঞ্জ, উত্তর দিনাজপুর।

হিন্দু মন্দিরে হামলা হচ্ছে, কং-বাম-তৃণুরা ভাবছেন আমরা তো সুরক্ষিত

বাংলাদেশে আজ হিন্দুদের অস্তিত্ব অবলুপ্তির পথে। এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি একমাত্র আর এস এস ও বিশ্ব হিন্দু পরিষদের মতো সামাজিক সংগঠন গুরুত্ব দিচ্ছে, কিন্তু কংগ্রেস, বামফ্রন্ট ও তৃণমূলের বন্ধুরা গুরুত্ব দিচ্ছে না। এরা মুসলমানদের মাথায় তেল দিতে দিতে নিজধর্মের প্রতি ঘৃণা উগরে বলছে যে, হিন্দুধর্ম হচ্ছে উগ্র এবং রামায়ণ হলো বানানো। কিন্তু ইরাকের পাহাড়ে শ্রীরামের মূর্তি পাওয়া গেলে তখন চুপ।

বাংলাদেশে হিন্দুমন্দির ভাঙার প্রতিযোগিতা চলছে। পুরোহিত থেকে মঠের সন্ন্যাসীরাও ছাড় পাচ্ছেন না। ভারতবর্ষেও একই কালচার শুরু হয়েছে। এদেশেও গ্রামগঞ্জে, এমনকী খোদ দিল্লিতে মন্দির ও দেবদেবীর মূর্তি ভাঙা হলো 'আল্লা-হু-আকবর' ধ্বনি দিয়ে। নেই কোনো প্রতিবাদ। নেই কংগ্রেস সিপিএম, তৃণমূলের রাজ্যসভা ও লোকসভায় প্রতিবাদের ঝড়। সবাই চুপচাপ। অধীরবাবুর হাস্যকর মোদী বিরোধী তরজা— মা গঙ্গা হলেন ইন্দিরা আর মোদী হলেন নর্দমা। উনি সাংসদ হয়েছেন লোকসভায় মোদীকে পরাস্ত করতে। পশ্চিমবঙ্গের উন্নতি তথা বহরমপুরের অসুবিধার কথা জানাতে সাংসদ হননি। কংগ্রেসের নেতা মণিশংকর আইয়ার, গুলাম নবি আজাদ, ফারুক আব্দুল্লা ও ওমর আবদুল্লা— এই চাররত্ন ভারতকে এত ভালোবাসেন যে পাকিস্তানের হাতে ভারতকে তুলে দিতে পারলেই এরা নিশ্চিন্ত। মোদী ও বিজেপির হাতে থাকলে ভারত শক্তিশালী হবে এটা কংগ্রেসের গাত্রদাহ। এই হলো নেহরু-ইন্দিরা-রাজীব- সোনিয়া-রাহুলের কংগ্রেস। বিজেপি বিরোধী দলগুলির নেতারা ভাবছেন, আমরা নেতারা সুরক্ষিত, কারণ আমরা হিন্দু হয়েও হিন্দুমন্দির ভাঙলে প্রতিবাদ করছি না। লোকসভা বা রাজ্যসভায় প্রতিবাদ জানাচ্ছি না। প্রতিবাদ করলে তো উগ্র মৌলবাদী সন্ত্রাসীরা আমাদের ছেড়ে দেবে না, এই ভয়ে! আরে, বিরোধী দলের দাদামণি ও দিদিমণিরা শুনে রাখুন, এদের উদ্দেশ্য ভারত দখল। আপনাদের মৌন থাকার কারণে বা প্রচ্ছন্ন মদতে একবার যদি এরা ভারত দখল করতে পারে তখন কিন্তু আপনারাও ছাড় পাবেন না। এই উগ্রবাদী মুসলমান মৌলবাদীরা কিন্তু কে কোন দল করেন তা দেখবে না। এরা প্রথমে ধর্মান্তরিত করাবে, গো ভক্ষণ করাবে ও মসজিদে নমাজ পরাবে। আর ইমামরা বলবেন, এটা ছোট্ট ঘটনা যেমন কিনা দিল্লিতে মন্দির ভাঙার পর এক ইমাম বললেন, এটা ছোট্ট ঘটনা।

বিরোধীদের প্রতি আমার আবেদন, আপনাদের যতই ক্ষোভ থাকুক বিজেপি দলের উপর বা মোদী-অমিত শাহের প্রতি সেটা মোকাবিলা করুন রাজনৈতিক পথে, কিন্তু ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির জীবন দিয়ে আগলে রাখা ভারতবর্ষ, যাতে উগ্র মুসলমান মৌলবাদীদের দখলে না যায় সেদিকে লক্ষ্য রাখুন। ছোট্ট ঘটনা, ছোট্ট ঘটনা বলে বলে

পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা আজ কী হয়েছে ভাবুন। পশ্চিমবঙ্গ এখন বাংলাদেশে পরিণত হতে চলেছে।

ঝাঁকে ঝাঁকে বাংলাদেশের জেহাদি সংগঠনের দাগি সন্ত্রাসীরা আস্তানা গেড়েছে পশ্চিমবঙ্গের মাদ্রাসাগুলিতে আর তৃণমূলের নেতার বাড়িতে। তবুও মমতা ব্যানার্জির কোনো চৈতন্য নেই। নেই মৌখিক প্রতিবাদ, নেই সিবিআই তদন্তের নির্দেশ, নেই মাদ্রাসা স্কুলগুলি বন্ধের তোড়জোড়, নেই মাদ্রাসার শিক্ষকদের জিজ্ঞাসাবাদ।

উল্লেখ্য, বাম আমলে মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধবাবু বলেছিলেন যে পশ্চিমবঙ্গে মাদ্রাসাগুলির বাড়বাড়ন্ত বন্ধ করতে হবে। এই মাদ্রাসাগুলি হলো সন্ত্রাসের আতুড়ঘর। উনি শত বাধা সত্ত্বেও সিমিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন। ওনার দলের মার্কসবাদী নেতারা বিষয়টি মেনে নিতে পারেননি। তৎকালীন কেন্দ্রের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আদবানীজীকে বিষয়টি জানান বুদ্ধবাবু। ঠিক মুদ্রার উল্টো পিঠে চলছেন মমতা ব্যানার্জি। আমল দিচ্ছেন না। পশ্চিমবঙ্গ আজ উগ্র মুসলমান মৌলবাদীদের খপ্পরে। আজ রাজ্যের নাম রাখা হবে বাংলা না জয় বাংলা— এই নিয়ে ভাবছেন। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ যে জামাতদের দখলে যাচ্ছে তাতে তাঁর চৈতন্য নেই।

আমার অনুরোধ কংগ্রেস, সিপিএম ও তৃণমূলের নেতাদের কাছে, একটু কষ্ট করে আর এস এসের শাখায় আসুন ও চরিত্রগঠন করুন। হৃদয়ে দেশভক্তি জাগিয়ে তুলুন। ভারতমাতাকে শ্রদ্ধা করতে শিখুন এবং ভারতবর্ষকে রক্ষা করার শপথ নিন। 'ভারতমাতা কী জয়' বলুন মনে প্রাণে। তিন বছরের ট্রেনিং নিন। আর এস এসের শাখা হলো দেশসেবক তৈরির কারখানা। দেখবেন, আপনাদের মন থেকে পাকিস্তান, চীন ও বাংলাদেশ প্রীতি উবে যাবে। একটি মেধাবী ছেলের লক্ষ্য যেমন নিজের ভবিষ্যৎ ও দেশের উন্নতি ঠিক তেমনি আর এস এসের কার্যকর্তাদের লক্ষ্য হলো প্রতি ঘর থেকে একজন স্বয়ংসেবক তৈরি ও দেশকে সুরক্ষিত রাখার সংকল্প।

—রাজু সরখেল,
দিনহাটা, কোচবিহার।

কাটমানি ও পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতি

বর্তমান পশ্চিমবঙ্গে অতি চর্চিত 'কাটমানি প্রসঙ্গ' 'ঠাকুর ঘরে কে রে, আমি তো কলা খাইনি' প্রাচীন এই বাংলা প্রবাদ বাক্যটির যথার্থ অর্থ আজ বেরিয়ে এল পশ্চিমবঙ্গ নামক একটা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর অতি ভাষণের ভিতর দিয়ে। বিগত লোকসভা ভোটে তৃণমূল কংগ্রেস নামক দলটির ভোট বিপর্যয়ে নিজে একার দায় না নিয়ে দলের কর্মীদের ঘাড়ে চাপিয়ে, দায় মুক্ত হওয়ার এই প্রচেষ্টা পশ্চিমবঙ্গের জনগণ ভালো চোখে নেয়নি, এই বোধটুকু দলনেত্রীর নেই। সততা প্রশ্নে দলনেত্রীর কতটা স্বচ্ছ থাকা জরুরি সেটা তিনি ভুলে গেলেন। তৃণমূল দলের অভ্যন্তরে যে দুর্নীতির পাহাড় জমে আছে বিগত লোকসভা হারের পর সুলুকসন্ধান খুঁজতে গিয়ে দলনেত্রীর মুখ থেকে আলটপকা মন্তব্য বেরিয়ে এল 'কাটমানি প্রসঙ্গ'। এক কথায় তোলা বাজি। এটা কি সতিই তৃণমূল নেত্রী আলটপকা মন্তব্য? পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিক মহলে এর আলোচনার বিরাম নেই। একদা সততার প্রতীক তকমধারী তৃণমূল নেত্রী ২০১১ সালে প্রথমবারে ক্ষমতায় আসার পর বছর ঘুরতে না ঘুরতে একের পর এক বিভিন্ন ধরনের অর্থনৈতিক ঘোটালা থেকে স্কুল সার্ভিস কমিশনে শিক্ষক নিয়োগের দুর্নীতিতে জেরবার হয়ে গেলেন। এসবের কোনো তদন্তে না গিয়ে দুর্নীতি ধামাচাপা দিতে কোটি কোটি টাকা খরচ করে হাইকোর্ট এমনকী সুপ্রিমকোর্ট পর্যন্ত পৌঁছেছিলেন। বিগত লোকসভা নির্বাচনে আশানুরূপ ফল না মিলায় এখন বলছেন দলের নীচুতলা থেকে উপরতলা পর্যন্ত কর্মীরা তোলাবাজি করে দলকে ডুবিয়েছে। দলনেত্রীর প্রচ্ছন্ন মদত না থাকলে একটা দলের অভ্যন্তরে এত বড়ো দুর্নীতির পাহাড় জমতো? 'লোকে ঠেকে শেখে'— এই প্রবাদবাক্যের মর্যাদা না দিয়ে রাজ্যের সার্বিক উন্নয়ন শিকেয় তুলে দিয়ে আবার প্রধানমন্ত্রী হওয়ার আশা সাময়িক ক্ষ্যান্ত দিয়ে রাজ্যসিংহাসনটা ২০২১-এর বিধানসভা নির্বাচনে ধরে রাখার ভোটকৌশলী প্রশান্ত কিশোরকে ৫০০ কোটি টাকার চুক্তিতে নিযুক্ত করার নিলর্জতার সীমা ছাড়িয়ে গেলেন। তৃণমূল দলনেত্রীর অভব্য আচরণে পশ্চিমবঙ্গের জনগণের সম্বিত ফিরে এল, যার ভয়ে ভীত তৃণমূল দলনেত্রী তাঁর দল সামলাতেই নাকাল। তৃণমূল দলনেত্রী আতঙ্কিত হয়ে দলের সম্পদগুলোকে 'কাটমানি খাওয়া' অভিযোগ দেগে দিয়ে দলে রাখার একটা কৌশল নিলেন। এই বুদ্ধিটা ভোটকৌশলী প্রশান্ত কিশোরের— এটা হলফ করে বলা যায়।

আজ ২০১৯-এ বিজেপির পালে যে হাওয়াটা লেগেছে সেটা জয় শ্রীরাম ধ্বনিকে তৃণমূল দলনেত্রীর 'গালাগালি' দেগে দেওয়া পশ্চিমবঙ্গের জনগণ এবং তামাম ভারতবর্ষের জনগণ ভালো চোখে নেয়নি। হালে বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ তথাকথিত নোবেলজয়ী অমর্ত্য সেনকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে কতকগুলো দেশবিরোধী ছাত্রদের সামনে হাজির করে জয় শ্রীরাম ধ্বনি বঙ্গসংস্কৃতির মধ্যে পড়ে না' এই মহাবাক্যটি ওই মহানব্যক্তিটির মুখ দিয়ে বলিয়ে তৃণমূল দলনেত্রীর জয় শ্রীরাম ধ্বনি 'গালাগালি'কে মান্যতা দিয়ে গেলেন। এটা তৃণমূল দলনেত্রী এবং ভোট কৌশলী প্রশান্ত কিশোরের যুগ্ম কৌশল। এ কৌশল গত ৩৪ বছর ধরে সিপিএম নামক দলটা বহুবার নিয়েছিল। অমর্ত্য সেনের বিজেপি বা নরেন্দ্র মোদী বিরোধিতা তৃণমূল নেত্রীর চেয়ে কম নয়। একজনের লক্ষ্য দেশবিরোধী জাতিদ্রোহী পাকিস্তানপন্থী কংগ্রেসকে ক্ষমতায় আনা, আর অপর জনের লক্ষ্য কোনোক্রমে রাজ্য সিংহাসনটি টিকিয়ে রাখা। ২০২১-এ 'হ্যাটট্রিক' করার সুযোগটাকেও হাতছাড়া করতে পারে?

—বিরূপেশ দাস,
বর্ধমান।

শিশুকে অযথা ধমক বা শাস্তির ভয় দেখানো ঠিক নয়

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ ধরুন, আপনার বাচ্চার বয়স তিন বা পাঁচ। সে খুবই ছোটো। আর এটা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, আজকাল সমস্ত বাচ্চাই খুবই দুরন্ত আর ছটফটে। আপনি তাই মাঝে মধ্যেই মেজাজ হারিয়ে ফেলেন। আজকাল সাইকোলজিস্টরা প্রায়ই বলেন যে, বাচ্চার গায়ে হাত দেবেন না, অন্য বাচ্চার সঙ্গে তুলনা করবেন না। এগুলো হয়তো আপনি এড়িয়ে চলেন। তবে মেজাজ হারিয়ে আপনি অত্যাধিক চিৎকার করেন আপনার বাচ্চার ওপর। অথবা তাকে কোনও না কোনও শাস্তি দেন।

বাচ্চা জন্মানোর পর

বাচ্চা জন্মানোর পর সব মায়েদের পোস্টপার্টম ডিপ্রেশন হয়। শারীরিক অসুস্থতা তো থাকেই আরও নানান সমস্যা হতেই থাকে। আবার নিউ বর্ন বেবিকে সামলানোর কাজ তো থাকেই। ফলে আপনি সেই সদ্যোজাত শিশুর ওপর চিৎকার করে ফেলেন মাঝে মাঝেই। অথচ আপনার কোনও কথাই সে বোঝে না। শুধুই ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে আর আপনিও চেঁচিয়ে যান। এতে কিন্তু সবচেয়ে ক্ষতি আপনার শিশুর হচ্ছে। আপনি অজান্তেই আপনার শিশুর 'স্লিপিং ডিসঅর্ডার' তৈরি করছেন। আপনার শারীরিক ক্ষতি তো হচ্ছেই সঙ্গে আপনার বাচ্চারও ক্ষতি হচ্ছে।

যখন বাচ্চার বয়স এক থেকে তিন

এই বয়সের বাচ্চারা সবচেয়ে বেশি চঞ্চল আর অ্যারোগেন্ট হয়ে ওঠে। এই সময় তাদের সামলানো খুব কঠিন। হয়তো আপনি তার ভালোর জন্যই তার ওপর চিৎকার করছেন অথবা তাকে শাস্তি দিচ্ছেন। যেমন ধরুন, তার জল নিয়ে খেলার খুব ইচ্ছে। জল ঘাঁটলে ঠাণ্ডা লাগবে। আপনি বুঝতে পারছেন। অথবা আপনি ভিজে মাটিতে দৌড়তে বারণ করছেন, সে শুনছে না। তার পড়ে যাওয়ার ভয় থেকেই আপনি এ কাজটা করছেন। সমস্যা হলো, আপনার চিৎকার বা শাস্তিতে কোনও কাজই হচ্ছে না। আপাতত হয়তো সে দৌড়নো বা জল ঘাঁটা বন্ধ করল। কিন্তু আপনার অবর্তমানে সে আবার একই কাজ



করতে থাকল। আপনি আবার চিৎকার করলেন দু'ঘা মেরেও দিলেন। সাইকোলজিস্টরা বলছেন, এতে আপনি বাচ্চাকে শুধরোতে পারবেন না। এতে আপনার বাচ্চার আত্মবিশ্বাস কমতে থাকে। সে মুখচোরা আত্মবিশ্বাসহীন এক ব্যক্তি হয়ে উঠবে। যার প্রভাব হয়তো আপনি তখন দেখতে পাচ্ছেন না। বরং সেটা দেখতে পাবেন তার ভবিষ্যত জীবনে।

এর জন্য আপনি কী করবেন? চিৎকার করতেই পারেন, সামান্য শাস্তিও দিতে পারেন। কিন্তু কাছে ডেকে আদর করে তাকে বোঝাতে হবে কেন আপনি তাকে বকলেন, কেন তাকে মারলেন বা শাস্তি দিলেন। আপনি যে তার ভালোর জন্যই এই সব করেছেন তাও ভালো করে বোঝান। আপনি হয়তো ছোটো শিশু ভেবে এই কথা তাকে কোনওদিন বলেননি। কিন্তু আপনি যতই ভাবেন যে, এরা কিছুই বোঝে না তা কিন্তু নয়। বুঝিয়ে বললে শিশুরাও আপনার কথা বুঝবে।

বাচ্চার বয়স যখন পাঁচ...

আপনার বাচ্চার বয়স যখন পাঁচ বছর সে তখন তুলনা করতে শিখছে। তখন আপনার ব্যবহার কীরকম তা অন্যকে বলবে। পরিবারের অন্য সদস্যদের বলবে, স্কুলে বা পারিবারিক অনুষ্ঠানে বলবে। অন্তত এই বয়সের বাচ্চাদের ইমাজিনেশন ক্ষমতা বেশি। তাই খানিক বাড়িয়ে বলবে এতে কোনও সন্দেহ নেই। এতে আপনার ইমেজ নষ্ট হবে। আপনার সঙ্গে আপনার সন্তানের সম্পর্ক খারাপ হবে। ফলে এই সময় থেকে বাচ্চার সঙ্গে ব্যবহারে দৃঢ়তা আনুন। মানে তাকে ধমকালেও বা শাস্তি দিলেও বুঝে-শুনে দিন। তাকে প্রথমে বোঝানোর চেষ্টা করুন। অযথা ভয় দেখাবেন না। বা এমন কোনও শাস্তির কথা বলবেন না যেটা বাস্তবে সম্ভব নয়। যেমন, হোমওয়ার্ক না করলে হাত ভেঙে দেবেন। আপনি নিজে হাতে সে কাজ আদৌ কোনওদিনই করতে পারবেন না। ফলে আপনার বাচ্চাকে হোমওয়ার্ক করানোর শর্ত এটা হতে পারে না। আপনার বাচ্চাও বুঝবে মা ফালতু কথা বলে। একটু বুঝে আপনার বাচ্চার সঙ্গে ব্যবহার করুন বা সঠিক ভাবে কথা বলুন। তাহলে ভয় এবং সম্মান আপনি তার কাছ থেকে পাবেন।

অহেতুক ভয় দেখানো

হয়তো আপনি বাচ্চাকে মারলেনও না, ভয়ও দেখালেন না। মেজাজ হারিয়ে চিৎকারও করলেন না। কিন্তু এমন সব বিদঘুটে জন্তু জানোয়ারের নামে ভয় দেখাতে শুরু করলেন যে, তাতেই সে কেঁপে অস্থির। অথবা আপনি আওয়াজ করে ভয় দেখাচ্ছেন আর বলছেন, 'ওই দেখো জুজু আসছে।' এসব করবেন না। তার চেয়ে তাকে শাস্তি দিন। ওই ছোট্ট বয়স থেকে মনের গভীরে ফালতু বিষয় নিয়ে ভয়ের জন্ম নিলে পরবর্তীকালে কোনও নতুন কাজ করতে গেলে অথবা নতুন স্কুলে ভর্তি হলে বা নতুন কোনও বিষয় ওর সামনে এলেই ওর আত্মবিশ্বাস কমে যাবে। ▮



বর্ষকালে ভালো থাকা ও হোমিওপ্যাথি

ডা: পার্থসারথি মল্লিক

বর্ষাকালে জলবাহিত রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। মহানগর এবং শহর ও নগরে যারা বাস করেন, তারা বর্ষাকালে জল ফুটিয়ে খান। যাদের আর্থিক অবস্থা ভালো তারা অ্যাকোয়া গার্ড-এর জল খাওয়া নিরাপদ। আজকাল বাজারে ফিল্টার ওয়াটারের নামে অনেক কোম্পানি জল বিক্রি করছে। এইসব জল একান্ত প্রয়োজন না হলে পান না করাই ভালো। বাড়ি থেকে জলের বোতল, ছাতা ও ওআরএস ব্যাগে নিয়ে বের হবেন। যারা গ্রামাঞ্চলে থাকেন, জল ফুটিয়ে ও জলে সামান্য ফিটকারি দিয়ে জল পান করুন। আসলে এত সতর্ক হওয়ার কারণ আছে। মাটির নিচে কলের পাইপ লাইন, সুয়ারেজের লাইন কিছু স্থানে পাশাপাশি আছে। দীর্ঘদিন ধরে পাশাপাশি লাইন থাকায় কোথাও পাইপ লাইন ফেটে গেলে সুয়ারেজের লাইন ফেটে একাকার হয়ে আছে। এছাড়াও নানা জলবাহিত জীবাণু জলে বংশবিস্তার করে থাকে। এই কারণে জল ভালোভাবে ফুটিয়ে খাওয়া ভালো। বর্ষকালে যাদের পেটের রোগ আছে বা অমাশায় বা সাদা অমাশয় যাই হোক না, সাবধান থাকতে হবে। বর্ষাকালে যারা স্যাঁতসেতে ঘরে বাস করেন তাদের ক্ষেত্রে জীবাণুবাহিত রোগ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এইজন্য যতটা সম্ভব ঘরে বাতাস চলাচল থাকলে ভালো হয়। ঘর যতটা সম্ভব শুকনো থাকলেই ভালো।

বর্ষাকালে নিত্য খাদ্য তালিকা সাবধানে নির্বাচন করা দরকার। এই সময় শাক-পাতা যতটা সম্ভব কম খেতে হয়। তবে থানকুনি পাতা গরম জলে ধুয়ে পেঁপে ডুমো ডুমো করে কালো জিরা দিয়ে পাতলা ঝোল খাওয়া ভালো। এটি সহজপাচ্য খাদ্য এবং যে কোনো বয়সেই পরিমিত খাওয়া যেতে পারে। এছাড়া হিঞ্চে শাক গরম জলে ধুয়ে ভাতের প্রথমে মাঝে মাঝে খাওয়া ভালো। মাঝে মাঝে আমিষ খাদ্য খেতে হলে মাংস পেঁপে সহযোগে সুসিদ্ধ করে খাওয়া যেতে পারে। ফলের মধ্যে জাম, মুসম্বি, পেয়ারা, আপেল, ন্যাসপাতি, কাঁঠারি কলা, মাঝে মাঝে পাকা আম খাদ্য তালিকায় রাখুন। রাস্তায় কাটা ফল, কোল্ড ড্রিঙ্কস, চাউমিন, ফুচকা, কচুরি, সিঙ্গাড়া, লুচি, দোকানের মিষ্টি দই এগুলো পরিহার করুন। রাস্তার আখের রস, মিষ্টি সরবত, বরফ দেওয়া লেবুর জল এগুলো খাবেন না। বাড়িতে লাউ উচ্ছে দিয়ে কাঁচা মুগের ডাল, ঝিঙে, ঢেঁড়স, চিচিঙ্গা, আলু দিয়ে কম তেল মশলা দিয়ে তরকারি রাতে রুটির সঙ্গে খেতে পারেন। মোটামুটি তেলমশলা কম ব্যবহার করা, সহজপাচ্য খাবার খাওয়া বর্ষাকালে ভালো। তবে খুম ঝমঝম করে অঝোরে বৃষ্টি পড়ছে তখন কয়েকরকম সব্জি যেমন বিন, গাজর, সয়াবিন, আলু দিয়ে খিচুড়ি খেতে পারেন। আর একটা কথা বলতে সাহস হচ্ছে না। বর্ষায় মাঝে মাঝে ইলিশ মাছে বেগুন দিয়ে ঝোল খেলেন। কিন্তু ইলিশ মাছের যা দাম! বাঙালির রসনা তৃপ্তির জন্য ইলিশ মাছের জুড়ি মেলা ভার। বর্তমান প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা তো ইলিশ মাছ অত পছন্দ করে না। আর ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মানুষ বোধহয় ইলিশ মাছের ছবিটাই বইতে দেখবে। বাড়িতে বাচ্চা থাকলে তার স্কুলের টিফিনের দিকে নজর দিন। অনেকে চাউমিন, এগ চাউমিন, পিজা এইসব খাবার বাচ্চাকে খেতে দেন বা টিফিন বাক্সে ভরে দেন। এগুলো বন্ধ করুন। তার বদলে পাতলা হাতে গড়া রুটি ও হালকা কম তেল মশলা দিয়ে সব্জির তরকারি দিন। অথবা পাউরুটি ভালোভাবে সেঁকে পাউরুটির উপর অল্প মাখন দিয়ে সঙ্গে একটা কাঁঠালি করা দিতে পারেন। কোনো দিন চিড়ে ও ছোলা ভাজা দিতে পারেন। বাড়িতে মাঝে মাঝে বাচ্চাদের অল্প মিষ্টি দিয়ে পায়েস তৈরি করে দিতে পারেন। স্কুল ব্যাগে টিফিনের সঙ্গে অবশ্যই পানীয় জল দেবেন। বাড়িতে বুড়ো মানুষ থাকলে তাকে সহজপাচ্য খাবার দেবেন। ঘরদোর বর্ষকালে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখবেন।

বর্ষাকালে স্কিন বা চামড়ার রোগ হতে পারে। এর কারণ নোংরা দূষিত জলে স্নান, গ্রামাঞ্চলে পুকুরের নোংরা জলে স্নান। বর্তমান সময় গঙ্গার জলে দূষণ বাড়ছে। এইসব জলে স্নান না করাই ভালো। দাদ হাজা চামড়ার র‍্যাশ বেরোনো, চুলকানি, একজিমা এসব রোগ বর্ষাকালে বাড়তে পারে। এর জন্য সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেওয়া দরকার। বাড়িতে জলে বাথটবে কয়েক ফোঁটা ডেটল ফেলে স্নান করুন। মোটামুটি যতটা সম্ভব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন জামাকাপড় পরতে হবে।

বর্ষার সময় ডায়রিয়া রোগটি যে কোনো বয়সেই হতে পারে। তবে ছোট শিশু এবং অতি বৃদ্ধ মানুষের ক্ষেত্রে খুব সাবধান হওয়া দরকার। যাদের পেটে প্রায়ই গণ্ডগোল হয়, অম্বল, বদহজম, চোঁয়া ঢেকুর ওঠে, তাদের খাদ্য নির্বাচন সতর্কভাবে করা ভালো। বর্ষাকালে খাটালের দুধ বাচ্চাদের বা বয়স্কদের না দেওয়াই ভালো। দুধ একান্তই পান করতে হলে মাদার ডেয়ারি, মেট্রো ডেয়ারির দুধ পান করুন। তবে রাত্রে দুধ না পান করলেই ভালো। দুধ কাটিয়ে ছানা তৈরি করে ওই ছানা বাচ্চাদের বা বয়স্কদের দেওয়া যেতে পারে।

বর্ষাকালে বৃষ্টি হলেও আবহাওয়া গরম থাকে। এইসময় সুতির পোশাক পরা ভালো। ভারী পোশাক, সিন্থেটিক-এর তৈরি কাপড় না পরাই ভালো। পোশাক পরিস্কার পরিচ্ছন্ন হতে হবে। ▮

মহাকাশ গবেষণায় ভারতের ঐতিহাসিক পদক্ষেপ

অরিন্দম মল্লিক

সাম্প্রতিক অতীতে চন্দ্রযান-২ ভারতের জাতীয় জীবনে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। বস্তুত, এক দশক আগেও ভারত কখনো চাঁদের রকেট পাঠাবে, একথা ভাবতে পারা বেশ কষ্টকর ছিল। কিন্তু ২২ জুলাই, ২০১৯, আপাতদৃষ্টিতে অবাস্তব সেই ঘটনাটি ইসরোর বিজ্ঞানীরা সফলভাবে ঘটিয়েছেন। এরপর যে ভারত একদিন চাঁদে নভশ্চরও পাঠাবে, সে ব্যাপারে আশা করি কেউ আর দ্বিমত পোষণ করবেন না।

চন্দ্রযান-২ ভারতের দ্বিতীয় চন্দ্রাভিযান। প্রথমটি ছিল চন্দ্রযান-১। এর সাংগঠনিক পরিকল্পনা এবং প্রযুক্তিগত কলাকৌশল রচনার যাবতীয় কৃতিত্ব ইন্ডিয়ান স্পেস রিসার্চ অরগানাইজেশন (ইসরো)র বিজ্ঞানীদের। ২২ জুলাই ২০১৯ তারিখে শ্রীহরিকোটার সতীশ ধাওয়ান স্পেস সেন্টার থেকে জিওসিনক্রোনাস স্যাটেলাইট লঞ্চ ভেহিকল মার্ক-৩ (জি এস এল ভি এম কে ৩) চাঁদের উদ্দেশে পাড়ি দেয়। ইসরোর বিজ্ঞানীরা গণনা করে দেখেছেন, পৃথিবী থেকে চাঁদের নিকটতম বিন্দুর দূরত্ব ১৭০ কিলোমিটার এবং দূরতম বিন্দুর দূরত্ব ৪৫,৪৭৫ কিলোমিটার। এবার আসা যাক রকেটের পে লোড প্রসঙ্গে। রকেটে রয়েছে একটি লুনার অরবিটার, একটি ল্যান্ডার এবং একটি লুনার রোভার। এই রোভারের নাম প্রজ্ঞান। এটি একটি রোবট। প্রজ্ঞান চাঁদের অভ্যন্তরে ঘুরে ঘুরে মানচিত্র তৈরি করবে এবং চাঁদের জল আছে কিনা তার সন্ধান করবে।

চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে অবতরণ করবে চন্দ্রযান-২-এর ল্যান্ডার। জায়গাটা সম্বন্ধে আগাম ধারণা দিয়েছেন বিজ্ঞানীরা। এটি একটি সমতলভূমি, চাঁদের দুই আগ্নেয়গিরি ম্যানজিনাস সি এবং সিমপেলিয়াস এনের ঠিক মাঝখানে। অবতরণের দিন অর্থাৎ ৭ সেপ্টেম্বর ২০১৯, ৭০ ডিগ্রি অক্ষাংশে অবস্থান করবে। চাকাবিশিষ্ট প্রজ্ঞান ১৪ দিন (এক চান্দ্র দিন) ধরে চাঁদের মাটির রাসায়নিক বিশ্লেষণ করবে এবং সেই তথ্য রিলে পদ্ধতিতে চন্দ্রযান-২ অরবিটারের মাধ্যমে পৃথিবীতে পাঠাবে। অরবিটারের কার্যকালের মেয়াদ এক বছর। এই এক বছরে ১০০ গুণিত ১০০ কিলোমিটার ক্ষেত্র জুড়ে অনুসন্ধান চালাবে।

চন্দ্রযান -২-এর প্রাথমিক উদ্দেশ্য চাঁদের সফ্‌ট-ল্যান্ডের সন্ধান এবং প্রজ্ঞানকে সঠিক দিশায় চালনা করা।



> চন্দ্রযান-২ সম্পূর্ণত ভারতীয় বিজ্ঞানীদের মেধাপ্রসূত। এমনকী, এই প্রকল্পে যে অরবিটার, ল্যান্ডার এবং রোভার ব্যবহার করা হয়েছে তাও ভারতে তৈরি।

প্রজ্ঞানের কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে ক্ষেত্রানুসন্ধান এবং চাঁদের মাটি সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ। প্রজ্ঞানের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব চাঁদের মেরু অঞ্চলে বরফের সন্ধান করা। বরফের সন্ধান পাওয়া গেলে জলের অস্তিত্ব সম্বন্ধে অনেকটাই নিঃসংশয় হওয়া যাবে। এখানে একটা প্রশ্ন উঠতে পারে, চাঁদে জল থাকা বা না-থাকা এত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠল কেন? বহুচর্চিত আর্টেমিস প্রকল্পে চাঁদে একটি বেস স্টেশন তৈরি করার প্রস্তাব রয়েছে। এই কারণেই চাঁদের জলের অস্তিত্ব সম্পর্কে নিঃসংশয় হওয়া প্রয়োজন। পাশাপাশি, পৃথিবীতে জনসংখ্যা যেভাবে বাড়ছে তাতে সুদূর ভবিষ্যতে স্থান সংকুলান করা বেশ কঠিন হয়ে পড়বে। কথাটা আজ আজগুবি বলে মনে হলেও অনেক বছর পর একদিন মানুষকে সত্যিই চাঁদে বা মঙ্গল গ্রহে গিয়ে থাকতে হবে। সুতরাং, মানুষের বেঁচে থাকার জন্য অতীব প্রয়োজনীয় দুটি জিনিস— অক্সিজেন এবং জল আছে কিনা সেটা জেনে নেওয়া খুবই জরুরি। চন্দ্রযান-২ সেই জরুরি দায়িত্ব পালনে ভারতের একটি ঐতিহাসিক পদক্ষেপ।

এই প্রসঙ্গে আরও একটি কথা বলা দরকার। চন্দ্রযান-২ সম্পূর্ণত ভারতীয় বিজ্ঞানীদের মেধাপ্রসূত। এমনকী, এই প্রকল্পে যে অরবিটার, ল্যান্ডার এবং রোভার ব্যবহার করা হয়েছে তাও ভারতে তৈরি। মোদী সরকারের মেক ইন ইন্ডিয়া প্রকল্পের সীমাহীন সাফল্যের মুখ হয়ে উঠেছে চন্দ্রযান-২। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ইসরোর বিজ্ঞানীদের অভিনন্দন জানিয়ে মহাকাশ গবেষণায় আরও সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আপাতত সারা দেশ আগামী ৭ সেপ্টেম্বরের অপেক্ষায়। এদিন চন্দ্রযান-২ চাঁদে অবতরণ করবে। দিনটা যে ভারতের মহাকাশ গবেষণার ইতিহাসে একটি মাইলফলক হয়ে উঠতে চলেছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

ভারতের একটি গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষামূলক অভিযান চন্দ্রযান-২

ড. নিশীথ দাস

মানুষ যতদিন এই পৃথিবীতে বসবাস করছে, ততদিন মুগ্ধ হয়ে চাঁদের শোভা উপভোগ করেছে। প্রথমে আমরা এই উপগ্রহকে খালি চোখে দেখেছি, তারপর টেলিস্কোপের সাহায্যে দেখেছি। পরবর্তীকালে ১৯৬৯ সালে ২০ জুলাই নীল আর্মস্ট্রং সশরীরে চাঁদের মাটিতে দাঁড়িয়ে চাঁদ দেখেছেন। ভারতের মহাকাশ গবেষণা সংস্থাও (ISRO) থেমে থাকেনি। ২০০৮ সালে ২২ অক্টোবর পিএসএলভিসি-১১ স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ যানের সাহায্যে চন্দ্রযান-১ কে চাঁদে পাঠায় এবং ২০০৯ সালের ১৪ নভেম্বর চাঁদের মাটিতে অবতরণ করে। এই প্রকল্পের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল চাঁদের পৃষ্ঠতলের মাটি এবং আবহাওয়া সংক্রান্ত তথ্য অনুসন্ধান করা। ১৩৮০ কেজির চন্দ্রযান-১ কে শ্রীহরিকোটায় সতীশ ধাওয়ান মহাকাশ কেন্দ্র শার থেকে উৎক্ষেপণ কথা হয়েছিল।

প্রায় সাড়ে তিন বছরের প্রচেষ্টায় ইসরো ২২ জুলাই, ২০১৯ বিকেল ২টা ৪৩ মিনিটে শ্রীহরিকোটা থেকে জিএসএলভি (জিওসিস্ক্রোনাম স্যাটেলাইট লঞ্চ ভেহিকল)-এম কে-৩ এর সাহায্যে চন্দ্রযান-২ উৎক্ষেপণ করেছে। এটি তিনটি যন্ত্রের সমন্বয়ে গঠিত— অরবাইটার, ল্যান্ডার এবং একটি রোভার। প্রায় ২৩৭৬ কেজি ওজনের অরবাইটারের ৩০০০ ওয়াট সৌরশক্তি উৎপাদনের ক্ষমতা আছে। এই যন্ত্রটি মূলত দুধরনের কাজ করবে। প্রথমত ইসরোর পরীক্ষাগারের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করবে। বিভিন্ন যন্ত্রের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য পাঠাবে এবং তাদের অবস্থান ও পরিস্থিতি জানাবে। এই কাজ করার জন্য অরবাইটারে ৮টি যন্ত্র বসানো হয়েছে। এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ভূখণ্ড পরিমাপ করার জন্য ক্যামেরা, তিন ধরনের উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন বর্ণালীবীক্ষণ যন্ত্র। সৌরমণ্ডল থেকে নিঃসৃত এক্স-রে মাপার যন্ত্র, চাঁদের ভূকম্পন মাপার যন্ত্র এবং পৃথিবীর সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য উচ্চ ব্যান্ডউইথ সম্পন্ন রিলে ব্যবস্থা।

ল্যান্ডারটির মহাকাশ গবেষণার স্থপতি ড. বিক্রম সারাভাইয়ের নামানুসারে নামকরণ করা হয়েছে 'বিক্রম'। ১৪৭১ কেজি ওজনের এই



ইসরো'র চেয়ারম্যান কৈলাসাভাদিভু শিবান

যন্ত্রটির ৬৫০ ওয়াট সৌরশক্তি উৎপাদনের ক্ষমতা আছে। এই যন্ত্রটি একদিকে যেমন অরবাইটার, রোভার এবং ভূপৃষ্ঠের অবস্থিতি পরীক্ষাগারের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে, অন্যদিকে অবতরণে সহায়তা করার জন্য উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন নেভিগেশন ক্যামেরা, দুর্ঘটনা এড়াবার জন্য ক্যামেরা এবং গতিমাপার যন্ত্র এবং চন্দ্রযানের সঙ্গে পাঠান সমস্ত যন্ত্রের সমন্বয় ঘটানোর জন্য সফটওয়্যার বহন করে।

রোভার একটি ছয় চাকাযুক্ত রোবোট, যেটি চাঁদের মাটিতে অন্বেষণের কাজ করতে পারে। সংস্কৃত ভাষায় 'জ্ঞান' এর অর্থ প্রজ্ঞা, সেই সূত্রে এই রোভারের নামকরণ করা হয়েছে 'প্রজ্ঞা'। এর ৫০ ওয়াট সৌরশক্তি তৈরির ক্ষমতা আছে এবং এটি ৫০০ মিটার পর্যন্ত চলাফেরা করতে সক্ষম। রোভার কেবলমাত্র ল্যান্ডারের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে কাজ করে। এটি চাঁদের পৃষ্ঠতলের অবস্থা, তেজস্ক্রিয়তা, চন্দ্রপৃষ্ঠের আশেপাশে অবস্থিত অতি সংবেদনশীল আয়োনস্ফিয়ার ও বায়ুমণ্ডলের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে ল্যান্ডারকে তথ্য প্রদান করবে। এর ওজন ২৭ কেজি যেটি ল্যান্ডারের মধ্যে বেশিরভাগ সময় অবস্থান করে। সামগ্রিকভাবে চন্দ্রযান-২ এর মুখ্য উদ্দেশ্য হলো চাঁদের পৃষ্ঠতল এবং বায়ুমণ্ডলের ভৌত, রাসায়নিক তেজস্ক্রিয় ও খনিজ ভাণ্ডারের অনুসন্ধান করা।

চন্দ্রযান-২ এর প্রেরণাভিযান ভারতবর্ষের কাছে একটি গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যপূর্ণ পরীক্ষামূলক অভিযান। এই অভিযান সফল হলে বিশ্বের দরবারে আমেরিকা, রাশিয়া ও চীনের পর ভারত হবে চতুর্থ দেশ, যে সফল চন্দ্রাভিযান করতে সক্ষম। একই সঙ্গে ভারতের আত্মবিশ্বাস ও সম্মান বহুগুণ বেড়ে যাবে। এর ফলে ভারত যে অর্থনৈতিক সুফল লাভ করবে বলাই বাহুল্য। এই অভিযান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য এই কারণে যে এই মিশনটির দুই পরিচালক মুথিয়া ভ্যানিথা ও ঋতু কারিবলে, দুজনেই মহিলা। ভারতবর্ষের সংস্কৃতি যেমন মাতৃশক্তিতে বিশ্বাস করে তেমনি মহিলাদের সশক্তিকরণের জন্য সদা সচেষ্ট থাকে। এই অবস্থায় দুজন মহিলা বিজ্ঞানীর তত্ত্বাবধানে শুধু সফল চন্দ্রাভিযান- নয়ই এই অভিযান নারীশক্তিকে উদ্বুদ্ধ করবে এবং গবেষণা মূলক কাজে অনুপ্রাণিত করবে তা আশা করাই যায়।





মহাবিশ্বে ইতিহাস গড়ার লক্ষ্যে ভারতের চন্দ্রযান-২

শর্মিষ্ঠা বসু

অধ্যাপিকা শর্মিষ্ঠা বসু কলকাতার বেহালা কলেজে অধ্যাপনা করেন। পদার্থবিদ্যায় স্নাতকোত্তর শেষ করে মহাকাশ বিজ্ঞান নিয়ে গবেষণা শুরু করেছেন। এবছর গত ২৭ জুন আমেরিকার বিখ্যাত মহাকাশ গবেষণা সংস্থা NASA স্যাটেলাইটের উপর একটি বক্তৃতা সভার আয়োজন করে, সেখানে তিনি গবেষণাপত্র 'Nano Satellite' নিয়ে বক্তৃতা দেওয়ার সুযোগ পান। তিনি একমাত্র ভারতীয়, যিনি NASA-তে বক্তৃতা দেওয়ার সুযোগ পেয়েছিলেন। ভারতের প্রতিনিধিত্ব করতে পেরে তিনি গর্বিত। এছাড়া গত ২০১৮ সালে অক্টোবর মাসে ভারতের মহাকাশ কেন্দ্র ISRO-তে তাঁর গবেষণাপত্র 'Aircraft Navigaton'-এর উপর বক্তৃতা বিশেষ প্রশংসা পেয়েছিল। ISRO-তে গবেষণাপত্রের উপর বক্তৃতা দেওয়ার জন্য মাইকেল মধুসূদন অ্যাকাডেমি তাঁকে আন্তর্জাতিক পুরস্কার স্বরূপ স্বর্ণপদকে ভূষিত করে। ISRO, NASA ছাড়াও মহাকাশ বিজ্ঞানের গবেষণার উপর তাঁর গবেষণা পত্র জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে প্রকাশিত হয়েছে।

বিগত কিছু বছর ধরে ভারতের গবেষণা সংস্থা ISRO সাফল্যের সঙ্গে মহাকাশ গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছে। Mars Orbital Mission ছিল ISRO-এর অন্যতম সফল উৎক্ষেপণ। উৎক্ষেপণ হয় ৫ নভেম্বর, ২০১৩। মঙ্গল গ্রহে সাফল্যের সঙ্গে মহাকাশযানটি পৌঁছে দেওয়া ছিল বিজ্ঞানীদের কাছে বড়ো চ্যালেঞ্জ। এরপর ছোটো ছোটো উপগ্রহ পাঠিয়ে ISRO গোটা পৃথিবীর মহাকাশ গবেষণায় উল্লেখযোগ্য জায়গা করে নেয়। এরপর ISRO-র বিজ্ঞানীদের গবেষণার কেন্দ্রবিন্দু হয়— চাঁদ।

কিন্তু হঠাৎ চাঁদ কেন? মহাজগতে তো আরও অনেক গ্রহ নক্ষত্র রয়েছে। তাহলে বিজ্ঞানীদের মনে কি শুধু চাঁদই জায়গা করে নিল? হ্যাঁ— সত্যি চাঁদ। চাঁদ নিয়ে মানুষের উৎসাহ উদ্দীপনা চিরন্তন। শুধুমাত্র বিজ্ঞানী বা ভারতীয়রাই নয়— চাঁদ সমগ্র বিশ্ববাসীর আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু। তাই চাঁদ নিয়ে শুরু হয় ISRO বিজ্ঞানীদের পথচলা, গবেষণা। শুধু বাইরে থেকে চাঁদের সৌন্দর্য উপলব্ধি করা বা



রোভার প্রজ্ঞান

গবেষণা করা বিজ্ঞানীদের কাজ নয়। তাঁরা দীর্ঘ আলোচনায় স্থির করলেন চাঁদে যাবে ISRO-র ভারতের নামাঙ্কিত মহাকাশযান-চন্দ্রযান-২।

মূলত ২০০৭ সালে ১২ নভেম্বর রাশিয়ার ফেডারেল স্পেস এজেন্সি আর ভারতের গবেষণা সংস্থা ISRO চুক্তি স্বাক্ষর করে চন্দ্রযান-২ নিয়ে। চুক্তিতে স্থির হয় মহাকাশযানটি তিনটি ভাগে তৈরি হবে। ভারতের ইসরো অরবাইটার এবং রোভারের দায়িত্ব নেবে এবং রাশিয়া ল্যান্ডার তৈরির দায়িত্ব নেবে। ২০০৮ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর ভারতে ক্যাবিনেট বৈঠকে এই মহাকাশ গবেষণা চুক্তির সিলমোহর পড়ে। শুরু হয় চন্দ্রযান-২-এর প্রস্তুতি।

তবে চন্দ্রযান-২ কেন? চন্দ্রযান-২ হলো ভারতের চন্দ্র অভিযানের দ্বিতীয় অধ্যায়। অর্থাৎ ২০০৮ সালে ভারতের গবেষণা সংস্থা চন্দ্রযান-১ চাঁদে পাঠায়। তখন লক্ষ্য ছিল— চাঁদের পৃষ্ঠে ম্যাগনেসিয়াম, ক্যালশিয়াম, সিলিকন, আয়রন আছে কিনা জানা অর্থাৎ খনিজ পদার্থের উপস্থিতি নির্ধারণ করাই ছিল চন্দ্রযান-১ এর মূল উদ্দেশ্য। তবে চন্দ্রযান-২ অভিযানের ক্ষেত্রে, বিজ্ঞানীদের গবেষণার উদ্দেশ্য একটু আলাদা। চন্দ্রযান-২ এর মূল উদ্দেশ্য— চাঁদের মাটিতে জলের অস্তিত্ব খুঁজে বের করা, চাঁদের আবহাওয়া নির্ধারণ করা, সেই আবহাওয়া জীবনযাপনের জন্য কতটা উপযোগী এবং আদৌ চাঁদে প্রাণের অস্তিত্ব আছে কি না তার সন্ধান করা। এই উদ্দেশ্যগুলোকে সামনে রেখেই শুরু হলো চন্দ্রযান-২ এর প্রস্তুতি।

২০০৯ সালের আগস্ট মাসে চন্দ্রযান-২ এর নকসা তৈরি করা হয়। সমগ্র মহাকাশ যানটি তৈরি করতে খরচ হয় প্রায় ১৭৮ কোটি টাকা। চন্দ্রযান-২ এর মাধ্যমে চাঁদের কক্ষে স্থাপন করা হবে— জিওসিক্রোনাস স্যাটেলাইট— MK III (GSLV MK III)। এটির তিনটি অংশ রয়েছে লুনার ল্যান্ডার (বিক্রম), লুনার রোভার (প্রজ্ঞান), লুনার আরবাইটার। সমগ্র মহাকাশ যানটির ওজন প্রায় ৩৮৫০ কিলোগ্রাম। GSLV MKIII এখনও পর্যন্ত ভারতের সবচেয়ে শক্তিশালী Satellite বা উপগ্রহ। এটির উচ্চতা ৪৩.৪৩ মিটার।

চন্দ্রযান-২ এর অরবাইটারের ওজন প্রায় ২৩৭৬ কিলোগ্রাম। এর মধ্যে লাগানো অত্যাধুনিক ক্যামেরার মাধ্যমে চাঁদের পৃষ্ঠ থেকে তথ্য সংগ্রহ করবে। চাঁদের পৃষ্ঠের প্রায় ১০০ কিলোমিটার উচ্চতায় স্থাপন করা হবে চন্দ্রযানের অরবাইটার। চন্দ্রযানের অন্য অংশটি হলো ল্যান্ডার— যার নাম বিক্রম। এর নামকরণ করা হয়েছে— Dr. Vikram Sarabhai,-এর নামে। এর সঙ্গে তিনটি অত্যাধুনিক ক্যামেরা লাগানো হয়েছে High Resolution Camera, Lander Hazar Detection Avoidance Camera (LHDAC), Lander Position Detection Camera (LPDC)। চন্দ্রযানের শেষ অংশটি হলো রোভার। রোভারের ওজন মাত্র ২৭ কেজি। এটি ছটি চাকাযুক্ত করা হয়েছে— নাম প্রজ্ঞান অর্থাৎ জ্ঞান। এটি চন্দ্রযানের ল্যান্ডারের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করবে। এটি প্রধানত খনিজ পদার্থের রাসায়নিক তত্ত্ব ব্যাখ্যা করবে।

চন্দ্রযান-২ গত ২২ জুলাই, ২০১৯ ভারতীয় সময় দুপুর ২টা ৪৩ মিনিটে বিজ্ঞানীদের তথা সমগ্র ভারতবাসীর আশা-প্রত্যাশা নিয়ে পৃথিবী তথা ভারতের মাটি ত্যাগ করে। সমগ্র চন্দ্রযানের অভিযানের নিয়ন্ত্রণ হবে— সতীশ ধাওয়ান স্পেস সেন্টার, ISRO থেকে।

আগামী ৭ সেপ্টেম্বর, ২০১৯ চন্দ্রযান-২ চাঁদের কক্ষে পৌঁছবে আর গবেষণা সংক্রান্ত অনেক তথ্য পৌঁছে দেবে ISRO-এর দরবারে। যার ফলে বিজ্ঞানীদের পরবর্তী গবেষণার পথ খুলে যাবে। ISRO বিশ্ববাসীর কাছে নতুন বার্তা পৌঁছে দেবে--- তৈরি হবে ভারতীয় মহাকাশচর্চার নতুন ইতিহাস। ■

চন্দ্রযান - ২ : চন্দ্রলোকে পাড়ি দিল ভারত, কতখানি লাভ হলো আমাদের ?

অনিন্দ্য বন্দ্যোপাধ্যায়

আমাদের চাঁদকে ছোঁওয়ার ইচ্ছে বহুদিনের। কবিতায় বা সিনেমার পর্দায় চাঁদের দেশে অনেকবার পৌঁছলেও, বাস্তবের যাত্রাটা কিন্তু সবকিছুর মতোই কোনোদিনই সহজ ছিল না। সে প্রযুক্তিগত বা আর্থিক দিক থেকেই হোক কিংবা রাজনৈতিক বা সামাজিক দিক থেকে। ২০০ বছরের ইংরেজ শাসনের পর দরিদ্র তৃতীয় বিশ্বের দেশ বলে পরিচিত ভারতের এই অভিযানকে, কিছু বছর আগে হলেও কিছু লোক হয়তো 'বামন হয়ে চাঁদে হাত বাড়ানোর' সঙ্গেই তুলনা করতেন। কিন্তু, সময় বদলেছে। বদলেছে আমাদের এই দেশও। সেই ইংরেজদের ছাপিয়েই বিশ্বের সাত দেশের মধ্যে একজন হয়ে চাঁদকে ছোঁয়ার স্বপ্ন সত্যি করেছে আমাদের ভারতবর্ষ।

আজ আমরা সবাই বিশ্বের সামনে দেশের এই জয়কে নিয়ে যতই উল্লাস করি না কেন, 'ইন্ডিয়ান স্পেস রিসার্চ অর্গানাইজেশন' (ইসরো)-র বিজ্ঞানীদের অক্লান্ত পরিশ্রম এবং নতুন সরকারের নির্ভীক দূরদর্শিতাকে কুর্নিশ জানাতেই হয়।

২০০৮ সালে 'চন্দ্রযান-১' পৌঁছয় চাঁদের কক্ষপথে। তার প্রাথমিক উদ্দেশ্য ছিল চাঁদের মেরু অঞ্চলের ছবি তোলা ও চন্দ্রপৃষ্ঠের রাসায়নিক বিশ্লেষণ করে সেখানে জলের সন্ধান করা। অনেক ক্ষেত্রেই সে অভিযান সফল হলেও, শেষমেশ আকস্মিক ভাবে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ায় অনেক কিছুই অধরা থেকে যায়।

তারপর অনেক জল গড়িয়ে গেছে। দেশের অন্দরে ঘটে গিয়েছে আমূল পরিবর্তন। বিজ্ঞানীদের তরফ থেকে বারংবার প্রচেষ্টা চালানো সত্ত্বেও, কংগ্রেস সরকার দেশের বৈজ্ঞানিক উন্নতিকর্মে সহযোগিতা করতে ব্যর্থ হয়। চাঁদও চলে যায় ধরাছোঁয়ার বাইরে।

এরপর, ২০১৪ সালে লোকসভা নির্বাচনে ভারতীয় জনতা পার্টি বিপুল ভোটে জয়লাভ করে। দেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন নরেন্দ্র মোদী। দেশের ভার কাঁধে নিয়েই বহুবার বিদেশ সফরে যান তিনি। দেখা করেন বিশ্বের তাবড় নেতাদের সঙ্গে। কিছুদিন পরেই দেশের দুর্নীতি রুখতে পুরানো নোট বাতিল করে নতুন নোট প্রকাশের কথা ঘোষণা করেন। তার কিছুদিন পরেই আসে জিএসটি। দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে উন্নতির জন্য অজস্র রদবদলের পাশাপাশি কাশ্মীরে জঙ্গি সংগঠনগুলির সন্ত্রাসী ক্রিয়াকলাপের বিরুদ্ধে একটানা লড়াই চালিয়ে যাওয়া, তিন তালাক বিল পাশের মতো একটি সাহসী পদক্ষেপ গ্রহণ এসবই নতুন সরকারকে পুরানোর থেকে আলাদা করে তোলে।

আজকের দুনিয়ায় 'সাধারণ মানুষ', ব্যস্ত মানুষ, চাকুরীজীবী বা ব্যবসায়ী, শহুরে বা গ্রামবাসী মানুষ চন্দ্রাভিযান কিংবা জঙ্গি হামলা নিয়ে যতটা চিন্তিত, তার থেকেও বেশি চিন্তিত নিজের অন্নসংস্থান নিয়ে। এই ব্যাপারটারই বরাবর সুযোগ নিয়ে এসেছে বিরোধীপক্ষ। নতুন সরকার যখন প্রত্যন্ত গ্রামে গ্রামে পাকা রাস্তা বানাল, অলিতে গলিতে আলো লাগাল, গ্যাসের দাম, তেলের দাম কমিয়ে আনল কিংবা যখন ধনীদের একান্ত মোবাইল ফোন এল বস্তিবাসীর হাতে, সস্তা হয়ে নাগালের মধ্যে এসে গেল ইন্টারনেট পরিষেবা, তখন নাক উঁচু বুর্জোয়াদের একটু হলেও ভুরু কুঁচকেছিল বৈকি। গরিব বড়লোকের মধ্যে বিভেদটা আবছা হয়ে যাচ্ছে যে! চা-ওয়ালার ছেলে প্রধানমন্ত্রী হলে তাঁরা আঙুল তুলে হেসেছিলেন। নোট বাতিল বা জি এস টি চালু হলে বিরোধীপক্ষ তীব্র ক্রোধে দিশেহারা হয়ে ওঠে। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে আঘাত বর্ষাতে থাকে নতুন সরকারের ওপর। নতুন নিয়মের প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে ওঠে প্রশ্ন। টেনে আনা হয় প্রধানমন্ত্রীর বিদেশ সফরকেও।

> অনেক বাধা টপকে, অনেক পথ পেরিয়ে ভারত ছুঁয়ে ফেলেছে চাঁদকে। দেশের কোনও প্রান্তেই আজ কোনও অভুক্ত শিশু চাঁদের দিকে ঝলসানো রুটি ভেবে তাকাবে না।

পুলওয়ামায় সেনা জওয়ানদের ওপর নির্মম জঙ্গি হানার প্রতিবাদে পাকিস্তানের মাটিতে নেমে সরাসরি সার্জিকাল স্ট্রাইকের নির্দেশ দেন প্রধানমন্ত্রী নিজে। সেই অভিযান সফল হলেও বিরোধীরা নির্লজ্জর মতো প্রমাণ চেয়ে বসেন।

এরপর, গুজরাটে সারা ভারতের গর্ব সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের মূর্তি 'স্ট্যাচু অব ইউনিটি' যা কিনা গোটা বিশ্বে সর্বাপেক্ষা উচ্চতম মূর্তি হিসেবে পরিচিত, মহাসমারোহে তার স্থাপন হলে বিরোধীরা আবার সদলবলে সরব হন।

সংবাদমাধ্যম স্বপক্ষ ও বিরোধীপক্ষ উভয়ের তর্ক বিতর্কই প্রকাশ্যে আনে। বিরোধীপক্ষের যুক্তি ছিল, দেশের সাধারণ মানুষের কষ্টের টাকাই নতুন সরকার যথেচ্ছভাবে উড়িয়ে জনগণের মনোরঞ্জনের জন্য অলীক জগৎ তৈরির চেষ্টা করছে। তাঁরা আশা করেছিলেন, জনগণ কোনোদিনই নিজের স্বার্থের আগে দেশের স্বার্থের কথা ভাববে না। কিন্তু ততদিনে বিপ্লব ঘটে গেছে দেশের কোনায় কোনায়। ইন্টারনেটের মাধ্যমে যুক্ত হয়ে গেছে কালীঘাটের সঙ্গে ক্যালিফোর্নিয়া কিংবা পাটনার সঙ্গে পর্তুগাল। ব্যক্তিস্বার্থ ঝেড়ে ফেলে প্রত্যেক ভারতবাসী যুক্ত হয়ে পড়েছে দেশের ভালো করার কাজে, দেশকে বড়ো করার কাজে।

২০১৯ সালে দ্বিতীয় বারের জন্য জয়লাভ করল ভারতীয় জনতা পার্টি। আগের থেকেও বেশি সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে প্রধানমন্ত্রী পদে শপথ নিলেন নরেন্দ্র মোদী। উত্তর থেকে দক্ষিণের মানুষ ভরসা রাখলেন গেরুয়া শক্তির ওপরেই। আর গত ২২ জুলাই অন্ধ্রপ্রদেশের শ্রীহরিকোটায় অবস্থিত সতীশ ধাওয়ান স্পেস সেন্টার থেকে সারা দেশের মাথা উঁচু করে চন্দ্রলোকের উদ্দেশে পাড়ি দিল ভারতে তৈরি 'চন্দ্রযান-২'।

শুধু তাই নয়, অন্যান্য দেশের চন্দ্র অভিযানের তুলনায় এর মোট ব্যয় অনেক কম হওয়ায় এটি আরও বড়ো কৃতিত্বের হকদার। চন্দ্রযান-২-এর মোট ব্যয় ৯৭৮ কোটি টাকা বা কমবেশি ১৪২ মিলিয়ন ডলার। মজার বিষয় হলো, হালে মুক্তি পাওয়া হলিউডি সিনেমা অ্যাভেনজার্স এন্ডগেম তৈরিতে খরচ হয়েছে প্রায় ৫০০০ কোটি টাকা বা কমবেশি ৭৫৬ মিলিয়ন ডলার। অর্থাৎ এরকম একটা মার্কিন সিনেমার বাজেটে মোটামুটি ৫টা চন্দ্র-অভিযান করার ক্ষমতা ধরে ভারতীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদরা।

অভিযান হলো অথচ সারা ভারতবর্ষের কোথাও কেউ না খেতে পেয়ে মরল না। কারও পকেটে এতটুকুও টান পড়ল না। কিন্তু তা সত্ত্বেও কংগ্রেসের ৪৯ বছরের রাজত্বকালে যা সম্ভব হলো না, তা নতুন সরকার এত কিছু সামলেও মাত্র পাঁচ বছরে কী করে করল বলুন তো?

এখন প্রশ্ন করলে উত্তর তো আসবেই। বিভিন্ন দিক থেকে আসবে। পক্ষে বা বিপক্ষে। অনেকে হয়তো তাঁর যুক্তি খাড়া করতে গিয়ে মোটা মোটা ইতিহাস ভূগোলের নথি খুলে বসবেন। আর সেই অতীতের ঘূর্ণাবর্তে পাক খেতে খেতে হয়তো আমরা আমাদের আগামীকেই ভুলে বসব। তাই খুব বেশি তর্ক বিতর্কে না গিয়ে আসুন দেখে নিই চন্দ্রযান-২ আমাদের জন্য কী কী চমক নিয়ে অপেক্ষা করছে। মানব সভ্যতার উন্নতিকল্পেই বা কী হতে পারে তার অবদান।

● চন্দ্রযান-২ অভিযান নিয়ে যারা এখনও ততটা সন্তুষ্ট নন তাদের আরও কিছু তথ্য দেওয়া যাক। বিজ্ঞানীরা শনাক্ত করেছে যে, চাঁদের যেখানে চন্দ্রযান নামবে, সেই অঞ্চলটিতে রয়েছে এক বিপুল ধাতব ভাণ্ডার। যার ভর ৪.৮ কুইন্টিলিয়ন পাউন্ড। মোটামুটি ধরতে গেলে প্রায় গোটা দুই পশ্চিমবঙ্গের সমান আয়তনের—মাটির বদলে ধাতু।

● চন্দ্রযান-২ অভিযান সফল হলে, ইসরোই হবে বিশ্বের মধ্যে একমাত্র মহাকাশ গবেষণাকেন্দ্র যারা চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে প্রথমবারের জন্য পদার্পণ করবে। ভারতের জন্য তো বটেই এমনকী, বিশ্বের প্রযুক্তিগত ক্ষেত্রে এটা এক বিরাট পদক্ষেপ। এতে চাঁদের এক অজানা দিকে আলোকপাত তো হবেই, সঙ্গে পথপ্রদর্শক হিসাবে ভারত পরবর্তীকালে অনেক কিছুর অধিকার অর্জন করতে সক্ষম হবে।

● চন্দ্রযান-২ প্রযুক্তিগত দিক থেকে একটা মাইলফলক তা বলাই বাহুল্য। এটা ইসরোর



ক্ষমতা প্রদর্শনের একটা সাফল্যের মাপকাঠি—যারা কিনা মহাকাশে শক্তিশালী রকেট পাঠাতে পারে, সেখানে জটিল পরীক্ষা সম্পন্ন করতে পারে, ভারী যন্ত্রপাতি মাধ্যাকর্ষের টান ছাড়িয়ে শূন্য মাধ্যমে চালনা করতে পারে এবং পারদর্শিতার সঙ্গে মহাকাশ থেকে পৃথিবীতে সংকেত পাঠানো, রাসায়নিক পরীক্ষা, চাঁদের মানচিত্র তৈরি করা, যোগাযোগ ও সেন্সর প্রযুক্তিতে নতুন দিশা দেখাতে সক্ষম। এর ফলস্বরূপ ভারতে তৈরি প্রযুক্তি বিশ্বে আরও মর্যাদা পাবে এবং চীনা প্রযুক্তি থেকে অবশ্যই মুক্তি লাভ করবে ভারতের যান্ত্রিক বাজার।

● ২০১৯ সালের ২৭ মার্চ ভারত প্রচুর ক্ষমতাসম্পন্ন অ্যান্টি- স্যাটেলাইট মিসাইলের উৎক্ষেপণ করে। চন্দ্রযান-২-এর সফল উৎক্ষেপণ ভারতের প্রতিরক্ষা ও অস্ত্রভাণ্ডারকে যে আরও মজবুত করবে তা আশা করাই যায়।

● ভারতের শিক্ষার মান বরাবরই বেশ ভালো। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে আর্থিক সম্বল যেমন সাহায্য করে তেমনি জরুরি মেধা থাকাটাও। আবার অনেক ক্ষেত্রে শিক্ষার বিভিন্ন প্রকারভেদের মধ্যে সঠিক পথ খুঁজে নেওয়াটাও সমস্যার বিষয়। মহাকাশ বিজ্ঞান এতদিন বিদ্যার্থীদের মধ্যে জনপ্রিয় বিষয় ছিল না। কিন্তু, চন্দ্রযান-২ অভিযানের সঙ্গে যুক্ত বিজ্ঞানীরা শিক্ষাক্ষেত্রে এই বিষয়টিকে জনপ্রিয় করে তুললেন। এই অভিযানের দায়িত্বপ্রাপ্ত বিজ্ঞানী চন্দ্রকান্ত কুমারের বাড়ি এই বঙ্গের মাটিতেই। প্রত্যন্ত গ্রামের এক কৃষক পরিবার থেকে উঠে এসে এই অসাধ্যসাধন, আগামী বাঙ্গালি প্রজন্মের কাছে এক অনন্যসাধারণ উদাহরণ হয়ে থাকবে।

● বর্তমানে বিশ্বজুড়ে উষ্ণায়ন চলছে। ভারতও তার ভয়াল প্রকোপ থেকে রেহাই পায়নি। চেন্নাই ও মহারাষ্ট্রে ভয়ানক খরার ক্ষত ও দেশের বহুলাংশে বৃষ্টির অভাব আগামীদিনে জলকষ্টের দুঃস্বপ্নের ইঙ্গিত দিচ্ছে। এখন মাথায় রাখা দরকার চন্দ্রযান ২-এর চাঁদে পাড়ি দেওয়ার অন্যতম মূল উদ্দেশ্য সেখানে জলের সন্ধান করা। এই অভিযান সফল হলে ভারত বিশ্বের জলকষ্টের সমস্যা অনেকটাই মেটাতে পারবে বলে আশা করা যায়। ফলস্বরূপ, আর কোনও বিশ্বযুদ্ধের সাক্ষী আমাদের হতে হবে না।

● জনসংখ্যা বৃদ্ধি ভারতের বহুদিনের সমস্যা। তার সঙ্গে পাল্লা বেড়ে চলেছে বেকারত্ব। প্রত্যেক সরকারের কাছেই এটা একটা বিরাট চ্যালেঞ্জ। এতগুলো মানুষের জীবিকা নির্ধারণ ও স্বাভবিক জীবন ধারণের জন্য ক্রমাগত অর্থের সরবরাহ খুবই প্রয়োজন। তার জন্য শিল্পের হাত ধরলেই তা দেশের যুবসমাজকে শক্ত জমিতে দাঁড় করাতে পারে। এবং তা দেশের উন্নতির একমাত্র উপায়ও বটে। এই অভিযানের ফলে দেশের প্রযুক্তিতে বিদেশি কোম্পানিগুলি আরও বেশি অর্থ বিনিয়োগ করতে ভরসা পাবে। এছাড়াও বিদেশে ভারতীয়দের কাজ ও উচ্চশিক্ষার সুযোগ আরও বাড়বে বলেই আশা করা যায়।

ভারত ছুঁয়ে ফেলেছে চাঁদকে। বাস্তবের চাঁদকে। অনেক বাধা টপকে, অনেক পথ পেরিয়ে আসতে হয়েছে। দেশের কোনও প্রান্তেই আজ কোনও অভুক্ত শিশু চাঁদের দিকে ঝলসানো রুটি ভেবে তাকাবে না। আজকের চাঁদ কবিতার চাঁদের মতোই স্নিগ্ধ। আলো ছড়িয়েছে তার দিকে দিকে। পথ হারালে আর কালো আকাশ হাতড়ে ধ্রুবতারাকে খুঁজতে হবে না। চাঁদ আছে যে। তেরঙ্গা রঙ লেগেছে তার গায়। ভয় কী!

এবিভিপি উত্তর কলকাতা শাখার উদ্যোগে কৃতী বিদ্যার্থী সংবর্ধনা

'আমাদের দেশে বহু সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, সাহিত্যিক যুব সংগঠন রয়েছে। কিন্তু যুব তথা ছাত্র সংগঠন হিসেবে বিদ্যার্থী পরিষদ একেবারে আলাদা। তারা ছাত্রশক্তিকে রাষ্ট্রশক্তিতে রূপান্তরিত করার কাজে ব্যাপৃত। দীর্ঘ পরাধীনতার কারণে দেশবাসী ভারতবর্ষের প্রাচীন জ্ঞানভাণ্ডার ভুলে বসেছে। অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ ছাত্র সমাজকে সেই



গৌরবময় অতীত ভারতবর্ষ স্মরণ করিয়ে বর্তমান ভারত গঠনে রাষ্ট্র চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে চলেছে।' গত ১৯ জুলাই অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের উত্তর কলকাতা শাখার উদ্যোগে কৃতী বিদ্যার্থী সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে কলকাতা ইউনিভার্সিটি ইনসটিটিউট হলে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল কেশরানাথ ত্রিপাঠী এভাবেই আগত ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্বুদ্ধ করলেন।

এদিন অনুষ্ঠানে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক উত্তীর্ণ ৭০০ ছাত্র-ছাত্রী ও তাদের অভিভাবকরা উপস্থিত ছিলেন। সভাকক্ষে সবার আসন সঙ্কুলান না হওয়ায় উদ্যোক্তারা বার বার ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছিলেন। মঞ্চে রাজ্যপালের সঙ্গে ছিলেন বিদ্যার্থী পরিষদের ক্ষেত্রীয় সংগঠন সম্পাদক গোবিন্দ নায়ের, রাজ্য সভাপতি ড. সুদীপ্ত মুখার্জি, সব সভাপতি ডাঃ ইন্দ্রনীল খান-সহ বেশ কয়েকজন কার্যকর্তা। অনুষ্ঠানের শুরুতে রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃত্য বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীরা রবীন্দ্র গীতিনৃত্য পরিবেশন করেন। বিদ্যার্থী পরিষদের উদ্দেশ্য-আদর্শ সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন গোবিন্দ নায়েক। এরপর রাজ্যপাল মহোদয় বিভিন্ন স্কুলের ২০জন ছাত্র-ছাত্রী যারা ৯০/৯৫ শতাংশ নম্বর পেয়ে মাধ্যমিক-উচ্চমাধ্যমিক উত্তীর্ণ হয়েছে তাদের বিশেষ ভাবে অভিনন্দন জানিয়ে তাদের হাতে একটি স্মারিকা, স্বামীজীর ফোটো ও পুষ্পস্তবক তুলে দেন। পরে একে একে সবাইকে মঞ্চে এনে একই ভাবে সংবর্ধনা দেন মঞ্চে উ পস্থিত কার্যকর্তরা।

অনুষ্ঠান সুচারু রূপে পরিচালনা করেন পায়েল ধর ও অভিষেক সিংহ হালদার।

ভারতীয় ভাষা পরিষদে ভারত বিকাশ পরিষদের স্থাপনা দিবস উদ্‌যাপন

গত ১৪ জুলাই কলকাতার প্রখ্যাত সেবা সংস্থা ভারত বিকাশ পরিষদের ৫৬ তম স্থাপনা দিবস উদ্‌যাপন অনুষ্ঠান হয় শেকসপিয়ার সরণি স্থিত ভাষা পরিষদের সভাকক্ষে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি রূপে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল কেশরীনাথ ত্রিপাঠী। ড. ঋতা ভট্টাচার্য প্রাস্তাবিক বক্তব্য রাখেন। উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট শিল্পপতি ও সমাজসেবী সজ্জন বনসল। তিনি বলেন, ভারত বিকাশ পরিষদের পরিচালনায় সারা ভারতে বিভিন্ন সেবা প্রকল্পের সঙ্গে সঙ্গে ৯০ হাজারেরও বেশি একল বিদ্যালয় চলছে। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন ভারত বিকাশ পরিষদের



সম্পাদক রাজীব কুমার আগরয়াল এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন শিল্পপতি ঘনশ্যাম সুগলা। অনুষ্ঠানে বহু গণ্যমান্য মানুষ উপস্থিত ছিলেন।

সিউড়ী সংস্কার ভারতীর নটরাজ বন্দনা অনুষ্ঠানে সম্মানিত লেটো সম্রাট হরকুমার গুপ্ত



শ্রীগুরু পূর্ণিমা তিথিকে শিল্পী সম্মাননা দিবস হিসেবে উদ্‌যাপন করে সিউড়ী সংস্কার ভারতী শাখা। তারই অঙ্গ হিসেবে গত ২০ জুলাই বিকেলে সিউড়ী শিক্ষক ভবনে 'নটরাজ বন্দনা' অনুষ্ঠানের আয়োজন করে শাখার সদস্যরা। সংগীত, নৃত্য ও কবিতায় সংস্কৃতির আদিগুরু নটরাজকে অর্ঘ্য নিবেদন করা হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতে নটরাজ প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করেন বিশিষ্ট অতিথিবর্গ। প্রদীপ প্রজ্বলন করে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন লোটো সম্রাট হরকুমার গুপ্ত, সভানেত্রী স্বপ্না চক্রবর্তী, বিশেষ অতিথি মানস চক্রবর্তী প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে লেটো সম্রাট হরকুমার গুপ্তকে সম্মাননা জ্ঞাপন করা হয়। তাঁর হাতে মানপত্র ও উপহার তুলে দিয়ে সভানেত্রী স্বপ্না চক্রবর্তী বলেন, 'যে সমস্ত প্রতিভাবান শিল্পী দীর্ঘদিন ধরে সংস্কৃতির ক্ষেত্রে নীরবে কাজ করে যাচ্ছেন এবং সেই সঙ্গে নতুন প্রজন্মকে সেই শিল্পকলায় উদ্বুদ্ধ করছেন তাঁদের খুঁজে বের করে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করাই সিউড়ী সংস্কার ভারতীর মূল লক্ষ্য। হরকুমার গুপ্ত নীরবে সংস্কৃতি জাগরণের কাজ করে চলেছেন। আমরা এহেন শিল্পীকে সম্মাননা জানাতে পেরে ধন্য হলাম।' উল্লেখ্য, লেটো গানের নেই কোনো প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা, নেই ছকে বাঁধা পাণ্ডুলিপি বা বই, কোনোরূপ লিখিত সংলাপের প্রায়োজন হয় না, কেবলমাত্র সহজাত কাব্য রচনার দক্ষতা ও নাট্যবোধের দৌলতেই যেকোনো বিষয় নির্বাচন করে মুখে মুখেই তৈরি হয় গান, তার সঙ্গে সুর ও সংলাপ। এই গানে পুরুষরাই মহিলা সেজে কণ্ঠ বদল করে মঞ্চ মাতিয়ে রাখে। বিলুপ্তপ্রায় এই গান আজও বুকে আঁকড়ে বীরভূমের মহম্মদ বাজারের খড়িয়া গ্রামের বৃদ্ধ শিল্পী হরকুমার গুপ্ত তাঁর দল নিয়ে ছুটে বেড়াচ্ছেন রাঢ়বঙ্গের এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্তে।

অনুষ্ঠানে প্রাস্তাবিক বক্তব্য রাখেন সুদীপ কুমার চট্টোপাধ্যায় এবং পরিচালনা করেন শুভঙ্কর দত্ত।

'অভিযাত্রী ফেরী'-র ৩২ তম সংখ্যা প্রকাশ অনুষ্ঠান



গত ২৭ জুলাই দক্ষিণ কলকাতার পাটুলির পূর্বাদ্রি আবাসনের সভাকক্ষে ড. অচিন্ত্য বিশ্বাস সম্পাদিত সাহিত্য পত্রিকার জল ও সংস্কৃতি বিষয়ক ৩২তম সংখ্যার প্রকাশ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি স্বস্তিকার পূর্বতন সম্পাদক ড. বিজয় আঢ্য সংখ্যাটির আনুষ্ঠানিক প্রকাশ করেন। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি রূপে উপস্থিত ছিলেন বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক ড. সুমহান বন্দ্যোপাধ্যায়। অন্যধারার লেখক দেবাশিস লাহা-সহ বহু গবেষণারত শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

শ্রীবড়বাজার কুমারসভা পুস্তকালয়ের রাজ্যপাল কেশরীনাথ ত্রিপাঠীর বিদায় সংবর্ধনা



'যে-কোনো সম্মান ব্যক্তির কাছে প্রেরণা হিসেবে কাজ করে। আপনাদের দ্বারা আজকের এই সম্মান আমার নিকট শুধু প্রেরণাস্রোতই নয়, অবিস্মরণীয়ও বটে। গত পাঁচ বছরে কলকাতা আমাকে যে সম্মান দিয়েছে তা জীবনে কোনোদিন ভোলা যাবে না।' গত ২৭ জুলাই কলকাতার প্রখ্যাত সামাজিক-সাহিত্যিক সংস্থা শ্রী বড়বাজর কুমারসভা পুস্তকালয় ও স্থানীয় ১০০টি সংস্থার উদ্যোগে স্থানীয় অসোয়াল ভবনের সভাকক্ষে পশ্চিমবঙ্গের বিদায়ী রাজ্যপাল কেশরানাথ ত্রিপাঠীর বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে কথাগুলি বলেন স্বয়ং শ্রীত্রিপাঠী। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন লখনউয়ের রাষ্ট্রধর্ম পত্রিকার সম্পাদক ড. ওমপ্রকাশ পাণ্ডে এবং প্রধান অতিথি রূপে উপস্থিত ছিলেন ইন্ডিয়ান মিউজিয়ামের নির্দেশক রাজেশ পুরোহিত। শ্রীপুরেহিত বলেন, মহামহিম রাজ্যপাল কেশরীনাথ ত্রিপাঠী জাদুঘরের নবনির্মাণের অনুমতি দিয়ে এক ঐতিহাসিক কাজ করেছেন।

অনুষ্ঠানের শুরুতে প্রখ্যাত গায়ক ওমপ্রকাশ মিশ্র শ্রীত্রিপাঠী রচিত 'ক্ষীতিজ কে উস পার দেখোঁ অভী হম, ইধর কা জীবন অভী অবশেষ হ্যায়' এবং ' ডগর কে সাথী হমেঁ তুম ইয়াদ রখনা' গীত পরিবেশন করে ভাবগম্ভীর পরিবেশ নির্মাণ করেন। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন ড. তারা দুগড় এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন বংশীধর শর্মা। উল্লেখ্য, সংবর্ধনা সভায় কলকাতা ও হাওড়া মহানগরের গণ্যমান্য ব্যক্তিত্বের উপস্থিতিতে সভাগার উপচে পড়ে।

ব্যারাকপুরে পূর্ব সৈনিক সেবা পরিষদের কার্গিল বিজয় দিবস উদ্‌যাপন

পূর্ব সৈনিক সেবা পরিষদের পশ্চিমবঙ্গ শাখা গত ২৮ জুলাই উত্তর ২৪ পরগনা জেলার ব্যারাকপুর স্টেশন চত্বরে মহাসমারোহে কার্গিল দিবস উদ্‌যাপন করে। অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন বিশিষ্ট সেবা মেডেল প্রাপ্ত ব্রিগেডিয়ার আশিস কুমার দত্ত (অবসরপ্রাপ্ত)। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কার্গিল যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী গ্রুপ ক্যাপ্টেন (অবসর প্রাপ্ত) সঞ্জয় ভট্টাচার্য, জেলা সৈনিক বোর্ডের উত্তর ২৪ পরগনা জেলা সম্পাদক সুবেদার (অবসর প্রাপ্ত) অজিত কুমার কর্মকার এবং হাবিলদার (অবসর প্রাপ্ত) মানবেন্দ্র চক্রবর্তী। এছাড়াও প্রাক্তন ভারতীয় ফুটবলার ইস্ট বেঙ্গল অধিনায়ক স্বপন সেনগুপ্ত এবং মোহনবাগান ফুটবলার কল্যাণ চৌবে। অনুষ্ঠানে সমজের সর্ব শ্রেণীর মানুষের উপস্থিতি ছিল।



কোচবিহারে উত্তরবঙ্গ বিশ্ব হিন্দু পরিষদের প্রাদেশিক কার্যকর্তা বৈঠক

গত ২০-২১ জুলাই উত্তরবঙ্গ বিশ্ব হিন্দু পরিষদের জেলা সমিতি সমূহের সভাপতি, সম্পাদক, জেলা কোষাধ্যক্ষ, বিভাগ কার্যকর্তা এবং প্রদেশের আয়াম সমূহের কার্যকর্তাদের নিয়ে প্রাদেশিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় কোচবিহার পরিষদ কার্যালয়ে। উত্তরবঙ্গের ১০ টি জেলা থেকে ৫১ জন কার্যকর্তা বৈঠকে অংশগ্রহণ করেন। উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় সৎসঙ্গ প্রমুখ বসন্ত রথ, প্রান্ত সংগঠন সম্পাদক অনুপ কুমার মণ্ডল, প্রান্ত সহ সভাপতি নিখিল চন্দ্র মজুমদার, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সহ ক্ষেত্র প্রচারক রমাপদ পাল প্রমুখ। বৈঠকে সমাপ্তি ভাষণ রাখেন প্রান্ত কার্যকরী সভাপতি বিদ্রোহী সরকার। বৈঠক পরিচালনা করেন প্রান্ত সম্পাদক উদয় সরকার এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন প্রান্ত সভাপতি ড. প্রকাশ চন্দ্র চক্রবর্তী।



আনন্দ নৃত্যে বিভোর চিরসত্য সনাতন নটরাজ

অমিত ঘোষ দস্তিদার

দ্যোতনার্থক দীব্ ধাতুর উত্তর অচ্ প্রত্যয় যোগে 'দেব' শব্দের ব্যুৎপত্তি হয়। যাঁর স্বরূপতায় প্রকাশিত হয় দ্যোতমানতা বা আলোকময়তা। আর এই আলোকময়তার মহান অর্থে— মহাদেব। তিনি মহান আলোকের মহান অধীশ্বর। মানুষকে সবসময় মনে রাখতে হবে— ''ন চ দৈবাৎ পরং বলম্'— অর্থাৎ দৈব বলের তুল্য আর বল নেই। সেই বলই আনন্দ নৃত্য-শক্তি। আদি, অনন্ত ও সর্বব্যাপী সেই মহিমা শক্তি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে সৃষ্টি সুখের উল্লাসে শিবময় করে রাখে। জীবনের দেবতা, মঙ্গলের দেবতা, মহাজীবনের দেবতায় সন্ধানরত থেকে চৈতন্য রাজ্যের অধিকারী হতে গিয়ে দেখা যাবে, চব্বিশ তত্ত্ব দিয়ে সাজানো এই মানবদেহ। ওই চব্বিশ তত্ত্বের উপাদানগুলি হলো— পঞ্চমহাভূত— ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম। পঞ্চতন্মাত্র— শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ। পঞ্চকর্মেন্দ্রিয়— বাক্, পাণি, পদ, পায়ু, উপস্থ। পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়— চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক। চারটি অন্তরিন্দ্রিয়— মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহংকার। চৈতন্য প্রাপ্তিতে আত্মার ভূমিকা থাকে। কারণ মানুষের দেহ আত্মাসহযোগে চৈতন্যপ্রাপ্ত হয়। অজ্ঞান থেকে জ্ঞানের আলোকে আসার মধ্যে থাকে এক তাণ্ডবপথ— যেখানে অবস্থান করেন অনাদির আদি ও সর্বকারণের কারণ এবং মৃত্যুরও মৃত্যু, অক্ষয়-অব্যয় ও সত্যের লক্ষ্যে নিত্য ও শাশ্বত সনাতন দেবাদিদেব মহেশ্বর। জীবাত্মা সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ— এই গুণের প্রভাবে ক্রিয়াশীল হয়। ত্যাগ দ্বারাই শান্তি আসে। সত্যনিষ্ঠা, ভগবৎবোধ, সৎপথে থাকা, সচ্চরিত্র— নিষ্ঠার সঙ্গে এইসব মেনে জীবনের পথে চলাই হলো মানুষের ধর্ম। ধর্মপথে সদা বিরাজ করেন মহান আলোকের মহান অধীশ্বর। তাই তো তাঁর এত ঔদাসীন্য। যেসব বস্তু কেউ গ্রহণ করেন না, তা একমাত্র তিনিই স্বীকার করেন। সমুদ্র মন্থনে সবাই রত্নধন গ্রহণ করলেন, কিন্তু শেষবারের মন্থনে ওঠা বিষ কেউ গ্রহণ করলেন না, বরং নিজেদের বিপন্নতায় দেবাসুর সকলে শিবের স্তুতি করতে লাগলেন। কারণ সর্বকালের সর্বলোকের একমাত্র তিনিই রক্ষাকর্তা। রক্ষাও সেই তিনিই করলেন। সমুদ্র মন্থনে ওঠা বিষ তিনিই পান করলেন এবং সেই বিষ পান করে শিব নীলকণ্ঠ হলেন।

মানুষের ভিতরে দেবতা আছে, আছে অসুর, আবার রাক্ষসও আছে। সত্য, সরলতা, শ্রদ্ধা, ভক্তি, বিশ্বাস, জ্ঞান, বৈরাগ্য ইত্যাদি সত্ত্বগুণী ভাবই হলো দেবতা, যা মানুষকে ভগবৎপথে নিয়ে যায়। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ,

মদ্, মাৎসর্য, নাম যশের আকাঙ্ক্ষায় থাকা, প্রভুত্বলিপ্সা হলো রজোগুণসম্পন্ন অসুর, যা মানুষকে ভোগের দিকে টানতে থাকে। হিংসা, দ্বেষ, পরনিন্দা, মিথ্যা, চৌর্য, রিপুর বশে ও মায়ার প্রভাবে মানুষ যন্ত্রচালিত জড়বস্তুর মতো চালিত হয়। মায়ার বন্ধন কাটিয়ে ওঠার জন্য চাই শিবের স্মরণাপন্ন হয়ে তাঁর নাম জপ ও ধ্যানজাত আত্মজ্ঞান লাভ।

রেচক, কুম্ভক, পূরকের সাহায্যে ঈড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না নাড়ির অবলম্বনে শ্বাস-প্রশ্বাসের মাধ্যমে সোহং মন্ত্র অথবা নিজ ইষ্ট মন্ত্রের সহকারে চতুর্দলে জীবের চৈতন্যশক্তি কুলকুন্ডলিনী যা অধোমুখে ঘুমিয়ে আছে— তাকে জাগাতে হবে এবং মুক্তিপথ মসৃণ করতে হবে। শ্বাস-প্রশ্বাসের ওঠানামায় একের পর এক নিগূঢ় সাধন প্রণালীর সাহায্যে ষট্চক্র ভেদ করে মূলাধারের কুন্ডলিনী শক্তিকে সহস্রধার মহাপদ্মে নিয়ে শিবশক্তির মিলন ঘটাতে হবে। আশুতোষ ভগবান শিব হলেন মোক্ষদাতা। তিনি ব্রহ্মা, বিষ্ণু সহ ব্রহ্মাণ্ডের সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা— সদাশিব। অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ পথে সৃষ্টি-ধ্বংস-সৃষ্টি নিয়ে একমাত্র তিনিই আনন্দে বিভোর হয়ে নৃত্যরত হয়ে আছেন।

সদাশিবের মহাশক্তির মিলন থেকে হয় স্বরূপদর্শন। মিলনানন্দের আনন্দে বিভোর হয়ে উঠতে পারলে দিব্যদর্শন— যা এক চরম প্রাপ্তি আর পরম জ্ঞান। ভক্তিভাব সমাধি দ্বারা ঘটে যায় অন্তরিন্দ্রিয়ের দর্শন, যা চির সত্য সনাতন। ওঁ পিণাকধৃক্— ইহগচ্ছ ইহগচ্ছ, ইহতিষ্ঠ-ইহতিষ্ঠ, ইহ সন্নিধেহি— ইহ সন্নিরুদ্ধস্ব অত্রাধিষ্ঠানং কুরু— স্থাং স্থীং স্থিরোভব— মম পূজাং গৃহাণ। ওঁ হরায় নমঃ। ওঁ মহেশ্বরায় নমঃ। ওঁ শূলপাণে ইহ সুপ্রতিষ্ঠিতো ভব।

নিত্য নৃত্যরত চিরসত্য সনাতন নটরজ শিব তাণ্ডব নৃত্যের স্রষ্টা। শিব অঙ্গহার, রেচক, পিণ্ডি সৃষ্টি করে তণ্ডুকে তা শিক্ষা দেন এবং তণ্ডু সেই নৃত্য কণ্ঠসংগীত এবং যন্ত্রসংগীত সহকারে পরিবেশন করেন। ধীর ও রৌদ্ররস সহকারে উদ্ধত ভঙ্গির এই নৃত্যই তাণ্ডবনৃত্য। নটরাজের বিভিন্ন নৃত্য অনুসারে তাণ্ডব নৃত্যকে সাতটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে— সংহার, ত্রিপুর, কালিকা, সন্ধ্যা, গৌরী, উমা, আনন্দতাণ্ডব। ভারতীয় নৃত্যে নটরাজ শিবকে নৃত্যের স্রষ্টা বলা হয়েছে। তাঁর নৃত্যের ভিতর দিয়েই বিশ্বব্যাপী সৃষ্টিচক্রের রূপ প্রত্যক্ষ করা হয়েছে। এই বিশ্বভুবন তাঁর অঙ্গ। তাঁর মুখ নিঃসৃত ওঙ্কার ধ্বনি সমগ্র জগতের শব্দ সৃষ্টির মূল। চন্দ্র-তারা তাঁর অলংকার। ত্রিকালজ্ঞ সাত্ত্বিক শিবকে জানাই প্রণাম।

নটরাজ সৃষ্টি এবং ধ্বংসের দেবতা। রজঃগুণে তিনি সৃষ্টি করেন। সত্ত্বগুণে পালন করেন এবং তমঃ গুণে ধ্বংস করেন।

নটরাজ যোগী বেশে (ছদ্মবেশে ভক্তদের পরীক্ষার জন্য) দক্ষিণ ভারতের তিল্লাই নামক স্থানে তর্কযুদ্ধে ঋষিদের পরাজিত করেন। ক্রুদ্ধ ঋষিগণ যজ্ঞ শুরু করেন। যজ্ঞাগ্নি থেকে বাঘ বের হয়ে শিবকে আক্রমণ করে, শিব কনিষ্ঠ অঙ্গুলের নখ দিয়ে বাঘের শরীর থেকে চামড়া খুলে নিজে পরিধান করেন। যজ্ঞ থেকে সাপ বের হয়ে এলে শিব তাকে গলার ভূষণ করে নেন। এরপর যজ্ঞাগ্নি থেকে বিকট আকার বামন দৈত্য বা বামনরূপী দৈত্য বের হলে শিব তাকে ঊর্ধ্বে নিক্ষেপ করেন এবং ভূমিতে পতিত হলে তাকে পদতলে রেখে আনন্দনৃত্য করেন।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর জাভাযাত্রীর চিঠিতে শিবের দুই রূপ বর্ণনা করেছেন। একভাগে শিব অশান্ত, সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয়, প্রশান্ত। অন্যভাগে পরিবর্তন পরম্পরার তাণ্ডবলীলা যা কালীর রূপের মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে।

নটরাজ রূপের মধ্যে সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের আবর্ত দেখা যায়। অপস্মর নামক মায়ারূপী দৈত্যকে বিনাশ করে শিব জীবকুল রক্ষাকারী মূর্তি ধারণ করেছেন। মহাজাগতিক নৃত্যের স্রষ্টা নটরাজ— সৃষ্টি, স্থিতি, সংহার, তিরোভাব ও অনুগ্রহ— এই পঞ্চক্রিয়ার আধার। পঞ্চক্রিয়ার অধিদেবতা— ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, মহেশ্বর, সদাশিব— শুধুমাত্র তিনিই।

নটরাজমূর্তি চার হাত বিশিষ্ট। দক্ষিণদিকে উপরের হাতে ডমরু— যা সৃষ্টির প্রতীক। ডমরু ধ্বনির সঙ্গে মহাপ্রাণ পঞ্চভূতের যোগ আছে। বাম দিকের উপরের হাতে প্রজ্বলিত অগ্নি ধ্বংসের প্রতীক। দক্ষিণ দিকের নীচের হাতে অভয় দান— পালনের প্রতীক। বাম দিকের নীচের হাতে 'গজহস্ত মুদ্রা'— যার অর্থ তাঁর চরণে আশ্রয় নিলে মুক্তিলাভ। এই হাত সর্ববিঘ্ননাশের প্রতীক। পদতলে পদ্মপীঠে অপস্মর বামন দৈত্যকে তিনি দলিত করছেন, অর্থাৎ অজ্ঞানকে বিনাশ করে তিনি মুক্তি এবং শান্তির জ্ঞানলোক দান করছেন। পিছনের চক্রাকারে অগ্নিগোলক প্রাণশক্তির অর্থাৎ ওঙ্কারের (অধ্যাপক সিমার-এর মতে) প্রতীক। নৃত্যের ছন্দে উৎক্ষিপ্ত শিব, শিবের জটাজাল গঙ্গা-হিমালয়-গোমুখী শরণাশ্রিত। কপালে অর্ধচন্দ্র (বা অগ্নি) জ্ঞানে প্রতীক। মাথার সর্প প্রকৃতি ও প্রাণশক্তির পরিচায়ক। এক কর্ণে পুরুষ ভূষণ এবং অন্য কর্ণে নারী ভূষণ প্রমাণ করে তিনিই একাধারে পুরুষ এবং প্রকৃতি।

তাণ্ডব নৃত্যের প্রকারভেদ— সংহার তাণ্ডব, ত্রিপুর তাণ্ডব, কালিকা তাণ্ডব, সান্ধ্য তাণ্ডব, গৌরী তাণ্ডব, উমা তাণ্ডব, আনন্দ তাণ্ডব, লাস্য, দ্রুতম্, অনুদ্রুতম্, আডাউ ইত্যাদি। নৃত্য ছাড়াও যাবতীয় ভারতীয় শিল্প, ভাস্কর্য ও সংস্কৃতির সঙ্গে নটরাজ শিব অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। ■

লোকচক্ষুর অগোচরে কোঁচ মন্দির

কৌশিক রায়

বিহার রাজ্যটির নাম উচ্চারিত হলেই মনের আয়নাতে ভেসে ওঠে গয়া, বোধগয়ার বুদ্ধমন্দির, নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্নাবশেষ এবং সারনাথের মৃগশিখাবনে গৌতমবুদ্ধের ধর্মচক্র প্রবর্তনের সম্মানে মৌর্য নৃপতি অশোকের স্থাপিত জাতীয় শিলাস্তম্ভটির ছবি। তবে প্রাচীন ভারতে 'অঙ্গ' নামে পরিচিত এই রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে আছে বিভিন্ন জানা-অজানা মন্দির। এগুলির মধ্যে এতদিন অনেকটাই লোকচক্ষুর অগোচরে ছিল গয়া থেকে ১৮ মাইল দূরে গয়া-দাউদনগর সড়কপথের ওপর অবস্থিত একটি গ্রামের মধ্যে থাকা 'কোঁচ' নামক পোড়া মাটির ইঁটের তৈরি মন্দিরটি। মোগলসরাই ও টিকারি হয়ে পৌঁছোনো যায় এই কোঁচ মন্দিরটিতে।

কোঁচ মন্দিরটির আশেপাশে আরও বেশ কয়েকটি ছোট, পোড়া মাটির ইঁটের মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে। তবে, এখনও প্রায় অক্ষত। মূল মন্দিরটি উচ্চতা প্রায় ৭০ ফিটে মতো। প্রায় চতুষ্কোণাকার এই কোঁচ মন্দিরের গর্ভগৃহটির আয়তন প্রায় ১১ বর্গফুটের মতো। দোতলা এই মন্দিরটির নির্মাণে যথেষ্ট উন্নতমানের প্রাচীন স্থাপত্যরীতির পরিচয় পাওয়া যায়। মন্দিরের ছাদ অনেকটাই খিলানাকৃতি বা আর্চ-এর মতো। মন্দিরটির সামনে গ্র্যানাইট পাথরের স্তম্ভ এবং পদ্মফুল খোদাইকরা নকশাযুক্ত স্তম্ভ-সহ একটি মণ্ডপও আছে। সম্ভবত বোধগয়ার মহাবোধি মন্দিরের মতো হলেও কিছুটা আলাদা স্থাপত্যশৈলী আছে কোঁচ মন্দিরের। কেননা কোঁচ মন্দিরের দেওয়ালগুলির ওপর দিকটা কিছুটা বাঁকানো, বোধগয়া মন্দিরের মতো সোজা নয়। কোঁচ মন্দিরের গর্ভগৃহে কোঁচেশ্বর শিব লিঙ্গ আছে। দুই ইংরেজ পুরাতাত্ত্বিক— স্যার আলেকজান্ডার কানিংহ্যাম এবং জন বেগলার জানিয়েছিলেন— কোঁচ শিবমন্দিরটিকে খুব সম্ভব অনেক বারই সংস্কার করা হয়েছিল। ১৮৭৮ সালে এই মন্দিরটির অর্ধবৃত্তাকার চূড়াটির বর্ণনা দেন বেগ্‌লার ও স্যার কানিংহ্যাম। মন্দিরের মধ্য থেকে গ্র্যানাইট এবং বেলেপাথরের (স্যান্ডস্টোন) তৈরি হর-গৌরী ও অষ্টশক্তির দুটি বিগ্রহ পাওয়া গেছে। এছাড়া, একটি লম্বা গ্র্যানাইট পাথরের ওপর বিষ্ণুর দশাবতারের রূপও খোদাই করা আছে মন্দিরে। এই মূর্তিগুলির মধ্যে বামন, কূর্ম ও মৎস্য অবতারের স্থাপত্য অসাধারণ। এই মন্দিরের শিবলিঙ্গটিকে অনেকে আবার মন্দার পর্বত এবং সুরাসুরের সমুদ্রমন্থনকালে মন্থনদণ্ড রূপে ব্যবহৃত মেরু পর্বতের প্রতীক মনে করছেন।

কোঁচ মন্দিরটি ঠিক যে কোন সময়ে নির্মিত হয়েছিল সেটি সম্পর্কে অনেক পুরাতাত্ত্বিকই একমত নন। মন্দিরটি শিব বা ভৈরবের প্রতি উৎসর্গীকৃত হলেও সূর্যদেবের প্রতি শ্রদ্ধা ও অর্পণ করা হয়েছে এই কোঁচ মন্দিরের স্থাপত্যসৌকর্যে। দেবী দুর্গার একটি রূপ এবং এক সময় মারাঠা-সূর্য-ছত্রপতি শিবাজী মহারাজের আরাধ্য দেবী ভবানীও এখানে কোঁচেশ্বর বা কোঞ্চেশ্বর (শিব)-এর সঙ্গে পূজিত হতেন বলে মনে করেন



স্থানীয় মানুষরা।

থানেশ্বরের পুষ্যভূতিরাজ হর্ষবর্ধনের শাসনকালে ভারতে আসেন চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ্। তাঁর প্রামাণ্য ভ্রমণ বৃত্তান্ত— 'সি-ইউ-কি' থেকে জানা যায়— এই কোঁচ মন্দিরটি নির্মাণ করেন একজন অজ্ঞাতনামা ব্রাহ্মণ। মন্দির স্থাপনের সময়কালটি হিউয়েন সাঙের মতে ছিল প্রথম থেকে ষষ্ঠ খ্রিস্টীয় শতকের মধ্যে। তবে, মেজর জেনারেল স্যার কানিংহ্যামের মতে— এই কোঁচ মন্দিরটি নির্মিত হয় সম্ভবত খ্রিস্টীয় অষ্টম শতকে। এই মন্দিরটির সর্বশেষ সংস্কার ১৪৫০ সালে সমাপ্ত করেন রাজা ভৈরবেন্দ্র।

এই মন্দিরটির সঙ্গে গয়া জেলারই অন্তর্গত দেও ও উমগা গ্রামে অবস্থিত দুটি পুরোনো এবং ধ্বংসপ্রাপ্ত মন্দিরের গঠনের অনেকটাই মিল আছে। ১৯০২ সালে ভারতের পুরাতাত্ত্বিক সর্বোক্ষণের (এ.এস.আই.) তদানীন্তন ব্রিটিশ আধিকারিক স্যার টিমোথি ক্লিচ এই মন্দিরগুলি পরিদর্শন করার সময় মন্তব্য করেছিলেন— "I have grouped these places together, because I consider it evident that the temple at Konch is of the same period and architectore as those of the temples in Deo and Umga in Gaya District, Bihar."

কোঁচ মন্দির সংলগ্ন প্রাঙ্গণে সাধারণ মানুষের পানীয় জলের প্রয়োজন মেটানোর জন্য একটি ইঁট ও বেলেপাথর বাঁধানো জলাধার ছিল। এখনও সেটির ভগ্নাবশেষ দেখতে পাওয়া যায়। কোঁচ মন্দিরের পশ্চিমে প্রায় ১২ ফুট ৩ ইঞ্চির মতো ক্ষেত্রফল বিশিষ্ট আরেকটি বর্গাকার ছোট মন্দিরের ধ্বংসাবশেষও পাওয়া গেছে। এই মন্দিরের মধ্যে একটি বিষ্ণুমূর্তি এবং একটি উপবিষ্ট বুদ্ধমূর্তিও পাওয়া গেছে। সম্ভবত বিভিন্ন ধর্মমতের সমন্বয়ের এক প্রাচীন উদাহরণ গয়ার এই কোঁচেশ্বরের মন্দির। ▮

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯
ফোন : ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩

PIONEER®
EXERCISE BOOK

Manufacturer of Exercise Book
& Office Stationery



PIONEER PAPER CO.
74, Beliaghata Main Road. Kolkata 700 010 India. Phone +91 33 2370 4152 / 2373 0556. Fax +91 33 2373 2596
Email pioneerpaperco@gmail.com. www.pioneerpaper.co

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন।
মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর,
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

সবার প্রিয়

বিল্লদা®

চানাচুর



BILLADA CHANACHUR
KALIKAPUR, BOLPUR, BIRBHUM, WB
Tel.: 03463 252447, Mob.: 9434306796

পাকিস্তানি আইনে দখল করা সম্পত্তি আদৌ ফেরত পাবে হিন্দুরা?

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ প্রত্যর্পণ কর, ফেরত দাও। আমলাদের কৌশল, ছলে-বলে-কৌশলে প্রত্যর্পণ ঠেকাও। এই অবস্থায় দাঁড়িয়ে স্বাভাবিকভাবে এই প্রশ্ন উঠবেই।



ঢাকা থেকে বিশেষ প্রতিনিধি

১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষ বিভক্ত হওয়ার পর তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান বা পূর্ব বঙ্গ থেকে জায়গাজমি দখল, হত্যা ও ধর্ষণের মাধ্যমে হিন্দু বিতাড়নের যে মহোৎসব শুরু হয়েছিল তা আরও গতিলাভ করে ১৯৬৪ সালে সাম্প্রদায়িক হামলা (অনেকে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বলেন, কিন্তু একতরফা হামলাকে দাঙ্গা বলা যায় না) এবং ১৯৬৫ সালে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের সময় শত্রু সম্পত্তি আইন জারির পর। ১৯৬৫ সালের সেপ্টেম্বরে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের সময় পাকিস্তান সরকার জরুরি অবস্থা জারি করে, তারই অংশ হিসাবে জারি হয় শত্রু সম্পত্তি আইন। মূল লক্ষ্য ছিল হিন্দুদের ভারতের নাগরিক হিসেবে গণ্য করে তাদের সম্পত্তি দখল এবং দেশ থেকে বিতাড়িত করে নির্ভেজাল একটি মুসলমান প্রধান ইসলামি দেশ প্রতিষ্ঠা করা। ১৭ দিনের মাথায় যুদ্ধ শেষ হয়ে গেলেও 'শত্রু সম্পত্তি' নাম দিয়ে হিন্দুদের জায়গা-জমি, বাড়িঘর দখলের মহোৎসব শুরু হয়ে যায়। জরুরি অবস্থা প্রত্যাহার করা হলেও হিন্দু নিগৃহের আইনটি বাতিল করা হয়নি।

কিন্তু ষাটের দশকের মাঝামাঝি থেকে দেশ স্বাধিকার থেকে স্বাধীনতার আন্দোলনে অগ্নিগর্ভ হয়ে ওঠায় সম্পত্তি দখলের গতি শ্লথ হয়ে পড়ে। মাত্র চব্বিশ বছরের মাথায় ভেঙে যায় পাকিস্তান। এক রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধে বাঙালির প্রথম স্বাধীন দেশ বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে।

১৯৭১ সালের ১৫ মার্চের কালো রাতে



অ্যাডভোকেট রানা দাশগুপ্ত

পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী বাঙ্গালিদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লে ২৬ মার্চ প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। এর পরই পাকিস্তানিরা বঙ্গবন্ধুকে গ্রেপ্তার করে রাওয়ালপিণ্ডি নিয়ে যায়। বঙ্গবন্ধুর চার সহকর্মী সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দিন আহমেদ, ক্যাপ্টেন মনসুর আলি ও মুহম্মদ কামারুজ্জামান ভারতে পালিয়ে গিয়ে অস্থায়ী বিপ্লবী সরকার প্রতিষ্ঠা করেন। এই বিপ্লবী সরকার ১৭ এপ্রিল বাংলাদেশের মুক্ত এলাকা কুষ্টিয়ার মুজিবনগরে শপথ গ্রহণ করেন। ওইদিন স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে বলা হয়েছিল, বাংলাদেশের মাটি ও মানুষের বৈরী সকল পাকিস্তানি আইন নতুন সরকার দায়িত্ব নেয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাতিল হয়ে গেল। সে হিসেবে কালো আইন বলে চিহ্নিত 'শত্রু অর্পিত সম্পত্তি আইন' স্বাধীন বাংলাদেশে বাতিল বলে গণ্য হওয়ার কথা।

ন'মাসের রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের পাশে দাঁড়িয়েছিল ভারত। বাংলাদেশের মুক্তিবাহিনীর সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে পাকিস্তানি হানাদারদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে ভারতীয় মিত্রবাহিনী। অবশেষে ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ-ভারত যৌথ কমান্ডের অধিনায়ক লে. জে. জগজিৎ সিংহ আরোরার কাছে আত্মসমর্পণ করে পাকিস্তানি বাহিনী। পরাজিত লে. জে. নিয়াজি ৯৩ হাজার সৈন্য নিয়ে আরোরার কাছে অস্ত্র সমর্পণ করেন। নতুন সূর্য ওঠে বাংলাদেশের স্বাধীনতার। ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী মুক্তিযুদ্ধের সময় সারাবিশ্বে দৌড়ঝাঁপ করেন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে সমর্থন আদায় এবং মুজিবের মুক্তির জন্যে। পাকিস্তানি বাহিনীর আত্মসমর্পণের পর পাকিস্তান সরকার আন্তর্জাতিক জনমতের চাপে বঙ্গবন্ধুকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়। ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি তিনি লন্ডন ও নয়াদিল্লি হয়ে স্বাধীন দেশের রাজধানী ঢাকায় ফিরে আসেন। বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ক শুধু অভিন্ন ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির কারণে নয়, ভারতীয় সেনাবাহিনী ও মুক্তিযোদ্ধাদের রক্ত মিশে গিয়ে এক নতুন অধ্যায় সূচনা করে। প্রায় বারো হাজার ভারতীয় সেনা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে প্রাণ উৎসর্গ করেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও ভারতের 'শত্রুর তকমা' মুছে যায়নি। স্বাধীন বাংলাদেশে শত্রু সম্পত্তি আইন বহাল তবিয়তে কার্যকর থাকে, শুধু নামটা পাল্টে হয় অর্পিত সম্পত্তি। তবে বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ ও আপিল বিভাগ কয়েক দফা রায়ে বলেছে, যেহেতু ১৯৭৪ সালের ২৩ মার্চ ১৯৬৯ সালের অধ্যাদেশ বাতিল করা হয়েছে, স্বাভাবিকভাবে অর্পিত (শত্রু) সম্পত্তি আইনের মৃত্যু ঘটেছে। সুতরাং এই মৃত আইনের আওতায় আর

কোনো অর্পিত সম্পত্তি ঘোষণার কার্যক্রম শুরু করা যাবে না। দুর্ভাগ্য বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করার পর সামরিক সরকাররা এই আইনকে জীবন দিয়েছে বারবার।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে হত্যার পর খুনিদের নেতা খন্দকার মোশতাক ক্ষমতা দখল করেন। কিন্তু এগারো সপ্তাহের মাথায় তাকে হটিয়ে পাল্টা ক্ষমতা দখল করেন সেনাপ্রধান জিয়াউর রহমান। তিনি অর্পিত (শত্রু) সম্পত্তি আইনকে সেই পাকিস্তানি জমানায় ফিরিয়ে নিয়ে গিয়ে কঠোরভাবে প্রয়োগ শুরু করেন। লুকায়িত সম্পত্তি খুঁজে বের করার নামে শুরু হয় এক নারকীয় অধ্যায়। ঘোষণা করা হয়, শত্রু সম্পত্তি খুঁজে বের করতে পারলে সম্পত্তির মোট মূল্যের একাংশ পারিতোষিক দেওয়া হবে। সেই লোভে সরকারি কর্মকর্তারা এবং স্থানীয় টাউট-বাটপাররা মহাউৎসাহে শত্রু সম্পত্তির খোঁজে মাঠে নেমে পড়ে। এই মাঠে নেমে পড়ার অর্থ হিন্দুদের ভয়ংকর পরিস্থিতির মুখে ঠেলে দেওয়া। কোনো পরিবারের কেউ একজন ভারতে চলে গেছেন এমন পরিবারের তো রক্ষা নেই, ভারতে যাননি এমন পরিবারও রেহাই পায়নি। যেমন ধরা যাক, শচীনবাবুর (কাল্পনিক নাম) দুই ছেলে। তাঁর সম্পত্তিতে শত্রু সম্পত্তির তকমা লাগিয়ে দখল করার জন্যে বলা হলো তাঁর তিন ছেলে। একজন ভারতে চলে গেছেন। শচীনবাবুর তিন ছেলে নয়, দুই ছেলে, পরিবারের কেউ ভারতে যায়নি এটা প্রমাণ করতে তার কালঘাম ছুটে যাবে। এই পর্যায়ে গোটা সম্পত্তি শত্রু বা অর্পিত সম্পত্তি নাম দিয়ে দখল হয়ে যাবে।

শচীনবাবু দেশে থাকলে চেঁচামেচি করবেন, তাই গোটা পরিবারকে ভয় দেখিয়ে ভারতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। এই বিভীষিকা সিংহভাগ হিন্দু পরিবারকে গ্রাস করে।

এরশাদ ক্ষমতায় আসার পর ১৯৮৪ সালে এক হিন্দু সমাবেশে ঘোষণা করেন, হিন্দুদের সম্পত্তি আর শত্রু সম্পত্তির তালিকায় উঠবে না। কিন্তু কার্যত কিছু হয়নি। আমলারা রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে যোগসাজসে এরশাদের ঘোষণার আগের নানা তারিখ দেখিয়ে সম্পত্তি শত্রু তালিকায় অন্তর্ভুক্তি অব্যাহত রাখে। এর মধ্যে এই কালো আইন বাতিলের দাবিতে ধারাবাহিক আন্দোলন, যা সূচিত হয়েছিল ১৯৭৭ সালে, আরও গতি লাভ করে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির অধ্যাপক আবুল বারকাতের গবেষণায় দেখানো হয়েছে, শত্রু অর্পিত সম্পত্তি আইনের মারপ্যাঁচে ১২ লক্ষ হিন্দু পরিবারের ৫০ লক্ষ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এই সংখ্যা মোট হিন্দু পরিবারের ৪০ শতাংশ। এই আইনে ভূমিচ্যুতির পরিমাণ ২৬ লক্ষ একর, যা হিন্দু সম্প্রদায়ের মূল ভূমি মালিকানার ৫৩ শতাংশ। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোর ৭৮ শতাংশ হারিয়েছেন কৃষি জমি, ৬০ শতাংশ হারিয়েছেন বসতভিটা এবং ২০ শতাংশ হারিয়েছেন ভূসম্পত্তি।' অধ্যাপক বারকাত আরও দেখিয়েছেন, 'শত্রু/অর্পিত সম্পত্তি আইনে ভূমি-জলা ও স্থানান্তরযোগ্য সম্পদ হারানোর আর্থিক ক্ষতির মোট মূল্যমান ২০১২-১৩ অর্থবছরের বাজার মূল্যে হবে কমপক্ষে ৬.৫ লক্ষ কোটি টাকা, যা ঐ অর্থবছরের মোট জাতীয় উৎপাদনের আনুমানিক ৬৩ শতাংশের সমান অথবা সরকারের বার্ষিক উন্নয়ন বাজেটের চার গুণেরও বেশি। আর্থিক এই ক্ষতি মোট প্রকৃত ক্ষতির একটি অংশমাত্র। আসলে শত্রু/অর্পিত সম্পত্তি আইনে প্রকৃত ক্ষতির আর্থিক মূল্যমান নিরূপণ সম্ভব নয়। কারণ মানুষের দুর্দশা-বঞ্চনা, জোরপূর্বক পারিবারিক বন্ধন বিচ্যুতি, মানসিক যন্ত্রণা, শারীরিক বিপর্যয়, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট, ভয়-ভীতির কারণে বিনিদ্র রজনী যাপন, মায়ের পুত্রশোক আর সন্তানের মাতৃশোক, মাতৃভূমি থেকে জোরপূর্বক উচ্ছেদ, মানবসম্পদ বিনষ্ট, স্বাধীনতাহীনতা—এসব ক্ষতির আর্থিক মূল্যমান অসীম, যা নির্ধারণ করা কোনো হিসাববিশারদের পক্ষেই সম্ভব নয়।' অধ্যাপক বারাকাতের মতে, 'শত্রু সম্পত্তি আইন এবং সংশ্লিষ্ট সাম্প্রদায়িক সংঘাত সংঘর্ষসহ বহু ধরনের বঞ্চনা-বিপর্যয়ের কারণে বিপুল সংখ্যক হিন্দুধর্মাবলম্বী মানুষ অনিচ্ছায় দেশান্তরিত হতে বাধ্য হয়েছেন। ফলে সৃষ্টি হয়েছে 'নিরুদ্দিষ্ট হিন্দু জনসংখ্যা'। এই নিরুদ্দিষ্ট হিন্দুধর্মাবলম্বী মানুষেরা হলেন সরাসরি 'অ-জনগণ', আর যারা এখনো নিরুদ্দিষ্ট হননি, তারা 'অ-জনগণ' হওয়ার প্রক্রিয়ায় আছেন মাত্র। আমার হিসেবে পাঁচ দশকে (১৯৬৪ থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত) আনুমানিক ১ কোটি ১৩ লক্ষ হিন্দুধর্মাবলম্বী মানুষ নিরুদ্দিষ্ট হয়েছেন অর্থাৎ গড়ে বছরে বাধ্য হয়ে দেশান্তরিত হয়েছেন আনুমানিক ২ লক্ষ ৩০ হাজার ৬১২ জন। অর্থাৎ প্রতিদিন গড়ে ৬৩২ জন হিন্দু ধর্মাবলম্বী মানুষকে দেশত্যাগে বাধ্য করা হয়েছে।

দীর্ঘ আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে শেখ হাসিনা ১৯৯৬ সালে প্রথম ক্ষমতায় আসার পর অর্পিত (শত্রু) সম্পত্তি আইন বাতিলের প্রক্রিয়া শুরু হয়। ২০০১ সালে অর্পিত (শত্রু) সম্পত্তি আইন বাতিল করে অর্পিত (শত্রু) সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন পাশ হয় জাতীয় সংসদে। কিন্তু এই আইন বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার আগেই নির্বাচনে বিএনপি-জামায়াত জোট ক্ষমতায় আসে। স্বাভাবিকভাবে এই আইন বাস্তবায়নের পথে হাঁটেনি নতুন সরকার।

অর্পিত (শত্রু) সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইনে বেশ কিছু ত্রুটি ছিল। শেখ হাসিনার নেতৃত্বে মহাজোট সরকার ২০০৮ সালে ফের ক্ষমাতায় এলে বাংলাদেশ হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের দাবির মুখে কয়েক বারই আইনটি সংশোধন করা হয়। আমলারা শত্রু সম্পত্তির দুটি তালিকা করেন—'ক' তালিকা ও 'খ' তালিকা। 'ক' তালিকায় যেসব শত্রু সম্পত্তি সরকারের দখলে আছে সেগুলো অন্তর্ভুক্ত হয়। 'খ' তালিকা সম্পর্কে বলা হয়, যেসব সম্পত্তি সরকারের হাতে নেই সেগুলো এই তালিকায় অন্তর্ভুক্ত থাকবে। ঐক্য পরিষদ প্রবল আপত্তি জানায় 'খ' তালিকা সম্পর্কে। ঐক্য পরিষদ যুক্তি দেখায়, আমলারা নিজেদের মতো করে তালিকা করেছে শত্রু সম্পত্তির, সরকারের দখলে নেই।

এগুলো আমলাদের সাজানো তালিকা। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঐক্য পরিষদের দাবির যৌক্তিকতা মেনে নেন এবং 'খ' তালিকা বাতিল করে দেন।

আইনে বলা হয়, প্রত্যর্পণের ক্ষেত্রে ট্রাইব্যুনালের রায়ই চূড়ান্ত। ট্রাইব্যুনালের রায়ের পর জেলা প্রশাসন সম্পত্তি ফিরিয়ে দেওয়ার পদক্ষেপ নেবে। কিন্তু যে কটি রায় হয়েছে, সবগুলোর ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে, জেলা প্রশাসকরা এ ব্যাপারে করণীয় জানতে চেয়ে আইন মন্ত্রণালয় কিংবা ভূমি মন্ত্রণালয়ের কাছে চিঠি লিখেছেন। অর্থাৎ সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আটকে দেওয়া হচ্ছে। ঐক্য পরিষদ বলছে, এটা সম্পূর্ণ বেআইনি। আইন লঙ্ঘন করে কাজটি করছেন জেলা প্রশাসকরা।

এদিকে গত বছর ১ এপ্রিল বিচারপতি ওবায়দুল হাসান ও বিচারপতি কৃষ্ণ দেবনাথের সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বেঞ্চ অর্পিত (শত্রু) সম্পত্তি প্রত্যর্পণের বিষয়ে এক রায়ে বলেছেন, 'সরকারের সকল কর্মকর্তাদের প্রতি এই মর্মে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে যে, ভবিষ্যতে যেন আর কোনো সম্পত্তি অর্পিত সম্পত্তি হিসেবে গেজেটভুক্ত করার কোনো প্রকার পদক্ষেপ নেওয়া না হয়। ইতোমধ্যে স্থাপিত ট্রাইব্যুনাল আপিল ট্রাইব্যুনাল যেন কঠোরভাবে আইনে প্রদত্ত সময়সীমার মধ্যে দায়েরকৃত আবেদন ও আপিলসমূহ নিষ্পত্তিতে সচেষ্ট হন। যে সকল জেলায় বিপুল সংখ্যক আবেদন শুনানির অপেক্ষায় আছে সেই সকল জেলায় একাধিক ট্রাইব্যুনাল স্থাপন করা যেতে পারে। সরকার যেহেতু অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন প্রণয়ন করে মূল মালিক বা উত্তরাধিকারীদের সম্পত্তি ফিরিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, সুতরাং রিট বা অন্য কোনো আবেদনের অজুহাতে ট্রাইব্যুনালের ডিক্রি কার্যকর করতে কোনো রকম বিলম্ব না করার জন্য সরকারি কর্মকর্তাদের নির্দেশ দেওয়া যাচ্ছে। অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইনের ১০(১) ধারার অধীনে আবেদন দায়েরের ক্ষেত্রে তামাদি আইন প্রযোজ্য হবে।'

রায়ের পর্যবেক্ষণে আরও বলা হয়েছে, '১৯৭৪ সালের ২৩ মার্চের পর বাংলাদেশের সীমানাভুক্ত কোনো সম্পত্তি শত্রু বা অর্পিত সম্পত্তি হিসেবে তালিকাভুক্ত করার সকল কার্যক্রম ও সিদ্ধান্ত বেআইনি এবং যে সকল ব্যক্তি এই কার্যক্রমের সাথে জড়িত ছিলেন তারা সবাই এই বেআইনি কাজের জন্য দায়ী বলে বিবেচিত হবেন। বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের উপরোক্ত নির্দেশনা সংবলিত রায় ঘোষিত হয়েছিল ১৯৮০ থেকে ২০০৪ সালের মধ্যে। এই সকল রায়ের ভিন্নমত প্রকাশ করে অদ্যাবধি একটি রায়ও ঘোষিত হয়নি উচ্চতর আদালত থেকে, সুতরাং যে সকল ব্যক্তি ১৮ জুন ১৯৮০ সালের পর অর্পিত বা শত্রু সম্পত্তি হিসেবে তালিকাভুক্তিতে জড়িত ছিলেন তাদের সবাই আদালত অবমাননার দায়ে দণ্ডনীয় অপরাধে অপরাধী বলে গণ্য হবেন।'

হাইকোর্টের এই রায়ের বিরুদ্ধে আইন মন্ত্রণালয়ের পরামর্শে ভূমি মন্ত্রণালয় সুপ্রিম কোর্টে লিভ টু আপিল দায়ের করে। কিন্তু হাইকোর্টের রায় স্থগিত করার কোনো নির্দেশ আপিল বিভাগ দেননি। অর্থাৎ রায় কার্যকর রয়েছে এবং সর্বশেষ সংশোধনী অনুযায়ী আপিল ট্রাইব্যুনালের রায় চূড়ান্ত এবং প্রত্যর্পণ প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকার কথা। কিন্তু আমলাতন্ত্র এবং আওয়ামি লিগের একটি অংশ লিভ টু আপিলের সুযোগ নিয়ে প্রত্যর্পণ আইন বাস্তবায়নের পুরো কাজটিই বন্ধ করে দিয়েছে, এই অভিযোগ ঐক্য পরিষদের।

বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট রানা দাশগুপ্ত অর্পিত (শত্রু) সম্পত্তি ফিরিয়ে দেওয়ার পথে বাধা সৃষ্টির জন্য আইন মন্ত্রণালয় ও ভূমি মন্ত্রণালয়ের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। তবে দাশগুপ্ত বলেন, এটা স্বীকার করতেই হবে, আজ প্রত্যর্পণের একটি অবস্থান তৈরি হয়েছে এবং আমরা এতদূর আসতে পেরেছি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আন্তরিকতায়। তিনি আমাদের দাবি মেনে অনেক আইনি বাধা দূর করেছেন। কিন্তু নানা অজুহাত তুলে বাধা দিচ্ছে আমলারা, পেছনে রয়েছেন শাসক দলেরই একাংশ। বিষয়টা দাঁড়াচ্ছে পাকিস্তানি আইনে দখল করা সম্পত্তি আদৌ কি ফেরত পাবে হিন্দুরা? এখন, প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ প্রত্যর্পণ কর, ফেরত দাও। আমলাদের কৌশল, ছলে-বলে-কৌশলে প্রত্যর্পণ ঠেকাও। এই অবস্থায় দাঁড়িয়ে প্রশ্ন উঠছে, পাকিস্তানি আমলের আইনে দখল করা সম্পত্তি আদৌ কি ফেরত পাবে হিন্দুরা? ■

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্ট

২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৭০০ ০০৬

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্ট আনন্দের সঙ্গে ঘোষণা করিতেছে যে, লেখাপড়া করিবার জন্য কৃতী ছাত্র-ছাত্রীদের বার্ষিক বৃত্তি ট্রাস্টের পক্ষ হইতে প্রদান করা হইবে। উপযুক্ত প্রমাণপত্র ও সুপারিশ সহ আবেদন গৃহীত হইবে। নিম্নলিখিত হারে বৃত্তি প্রদান করা হইবে। :—

নবম এবং দশম শ্রেণী বার্ষিক	১০০০ টাকা
একাদশ এবং দ্বাদশ শ্রেণী বার্ষিক	১৫০০ টাকা
কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় বার্ষিক	২০০০ টাকা

আবেদনপত্র সম্পাদক, স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্ট-কে করিতে হইবে।

৫.৮.২০১৯

সম্পাদক
স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্ট

প্রিয়ার অপ্রিয় সত্য কথন বাংলাদেশের মুখোশ খুলে দিয়েছে

শিতাংশু গুহ



'প্রিয়া প্রিয়া প্রিয়া বলে কে ডাকে আমাকে' এ গান এখন বাংলাদেশে সবাই কোরাস গাইছেন। গত ক'দিনে 'প্রিয়া' নাম লক্ষ লক্ষ বার উচ্চারিত হয়েছে। এখনো হচ্ছে। প্রিয়া মানে প্রিয়া সাহা, তিনি একবারে হাটে হাঁড়ি ভেঙে দিয়েছেন। 'সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি'র' (!) বাংলাদেশে একজন মাত্র হিন্দু রমণী বেজায় অশান্তি সৃষ্টি করেছেন। বাংলাদেশে হিন্দু নির্যাতনের কথা লিখতে গেলে একটি মহাভারত হয়ে যাবে। প্রিয়া সাহা সেই মহাভারতের দু'তিনটি বাক্য মাত্র ৪৩ সেকেন্ডে বলে ফেলেছেন, তাতেই সব অশান্তি। তবে তিনি যা বলেছেন, তা বাংলাদেশের দু' কোটি হিন্দুর মনের কথা। তাকে ধন্যবাদ জানাতে হয় সাহস নিয়ে কথা বলার জন্যে। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পকে ধন্যবাদ জানাই তিনি প্রিয়া সাহা'র কথা শুনেছেন বলে।

প্রিয়া সাহা মার্কিন প্রেসিডেন্টকে বলেন, ''স্যার, আমি বাংলাদেশ থেকে এসেছি। এখানে ৩৭ মিলিয়ন হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী মানুষ হারিয়ে গেছেন। দয়া করে আমাদের সাহায্য করুন। আমরা আমাদের দেশে থাকতে চাই। এখনও সেখানে ১৮ মিলিয়ন সংখ্যালঘু মানুষ আছে। আমার অনুরোধ, দয়া করে আমাদের সাহায্য করুন। আমরা আমাদের দেশ ছাড়তে চাই না। শুধু আমাদের বাংলাদেশে থাকার জন্য সাহায্য করুন।' তিনি আরও বলেন, 'আমি আমার বাড়ি হারিয়েছি। তারা আমার বাড়ি পুড়িয়ে দিয়েছে, আমার জমি কেড়ে নিয়েছে। কিন্তু কোনো বিচার হয়নি। এসময় ট্রাম্প জিজ্ঞাসা করেন, 'কারা জমি দখল করেছে? কারা বাড়ি দখল করেছে? জবাবে প্রিয়া সাহা বলেন, 'মুসলিম মৌলবাদী গ্রুপ এগুলো করছে। তারা সব সময় রাজনৈতিকভাবে আশ্রয় পায়। সব সময়।''

মার্কিন প্রেসিডেন্টের সঙ্গে প্রিয়া সাহার কথপোকথন মাত্র ৪৩ সেকেন্ডে। হোয়াইট হাউসে ১৭টি দেশের ধর্মীয় নিপীড়নের শিকার ২৭জন মানুষের সঙ্গে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প এক বৈঠক করেন ১৭ জুলাই ২০১৯। প্রিয়া সাহা সেখানে কথা বলার সুযোগ পান। একদা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রোকেয়া হলের ছাত্রী প্রিয়া সাহা বাংলাদেশ হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের অর্গানাইজিং সেক্রেটারি এবং এর আগে তিনি মহিলা ঐক্য পরিষদের সম্পাদক ছিলেন। তাঁর বাপের বাড়ি পিরোজপুর জেলার চরবানিয়ার মাটিভাঙা নাজিরপুর। সেই বাড়ি পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে এ বছর ২রা মার্চ। ঐক্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক রানা দাশগুপ্ত বলেছেন, তারা এনিয়ে জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে মানববন্ধন করেছেন। কিন্তু বিচার হয়নি। ২২জুলাই খবরে জানা যায়, ঐক্য পরিষদ থেকে প্রিয়া সাহা সাময়িক বহিষ্কৃত হয়েছেন। ঐক্য পরিষদে 'ক্যু' হয়েছে? গা বাঁচাতে হিন্দুরা এখন প্রিয়া সাহার বিপক্ষে অবস্থান নিচ্ছেন। গুজব উঠেছে, হিন্দুরা কেউ কেউ গ্রেফতার হওয়ার আশঙ্কা করছেন।

প্রিয়া সাহা ৩ কোটি ৭০ লক্ষ সংখ্যালঘুর হারিয়ে যাবার কথা বলেছেন, যা সত্য। সংখ্যাটি কারো কারো মতে একটু বেশি। কারো কারো মতে একটু কম। প্রিয়া সাহা 'দলিত কণ্ঠ' নামে একটি পত্রিকার সম্পাদক। তাঁর এনজিও 'শাড়ি' মূলত দলিত ও সংখ্যালঘু নিয়ে কাজ করে। তিনি যে সংখ্যাটি দিয়েছেন, তা হিসাবে করেই দিয়েছেন। এ বিষয়ে তাঁর এনজিও'র গবেষণা আছে। এ বিষয়ে তিনি একটি ব্যাখ্যা দিয়ে বলেছেন, প্রফেসর আবুল বারাকাতের সঙ্গে গবেষণার ফসল এই সংখ্যা। যদিও আবুল বারকাত এখন বলেছেন, প্রিয়া তার সঙ্গে কাজ করেননি। আসলে সবাই এখন প্রিয়া সাহার কাছ থেকে দূরত্ব বজায় রাখতে চেষ্টা করছেন!

নিউইয়র্ক সুনি ওল্ড ওয়েস্টবেরি ইউনিভার্সিটির ডিস্টিংগুইশ প্রফেসর ড. সব্যসাচী ঘোষ দস্তিদার তাঁর ২০০৮ সালে প্রকাশিত 'এম্পিয়ার্স লাস্ট কজুয়াল্টি ইন্ডিয়ান সাবকন্টিনেন্ট ভ্যানিশিং হিন্দু অ্যান্ড আদার মাইনোরিটিজ' বইয়ে ১৯৪১ থেকে উপমহাদেশের জনসংখ্যা পরিসংখ্যান ঘেঁটে হিসাব কষে দেখিয়েছেন যে, সাবেক পূর্ব-পাকিস্তান বা বর্তমান বাংলাদেশ থেকে ৪৯ মিলিয়ন হিন্দু হারিয়ে গেছে। তাঁর এই বইয়ের উদ্ধৃতি দিয়ে ইলিনয়েসের তৎকালীন কংগ্রেসম্যান রবার্ট ডোল্ড ২৯ জুলাই ২০১১ সালে ওয়াশিংটন ডিসিতে এক হিয়ারিং-এ বলেন যে, ১৯৪৭ সাল হতে এ পর্যন্ত বাংলাদেশ থেকে ৪৯ মিলিয়ন হিন্দু হারিয়ে গেছে। আমি সেই হিয়ারিং-এ উপস্থিত ছিলাম।

ঢাকা ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক আবুল বারাকাত পরিষ্কার বলেছেন ২০৩০ সালের পর বাংলাদেশে হিন্দু থাকবে না। তাঁর মতে এখনো প্রতিতিন বাংলাদেশ থেকে ৬৩০ জন হিন্দু চলে যাচ্ছে। গা বাঁচাতে এখন তিনিও পিছুটান দিচ্ছেন। গণজাগরণ মঞ্চের নেতা ইমরান এইচ সরকার ২১ জুলাই ২০১৯ সামাজিক মাধ্যমে একটি হিসাব দিয়েছেন। তিনি দেখিয়েছেন যে, ১৯৪৭ সালে দেশভাগের সময় বাংলাদেশের জনসংখ্যার ৩০%-এর বেশি ছিলেন হিন্দু। ২০১৯-এ তা ৮%। জাতিসঙ্ঘের হিসাব অনুযায়ী বাংলাদেশের জনসংখ্যা ১৭০ মিলিয়ন। তাহলে ৩০% হিসাবে বাংলাদেশে হিন্দু জনসংখ্যা থাকার কথা ছিল ৫ কোটি ১০ লক্ষ। কিন্তু ৮% হিসাবে এখন হিন্দু আছেন ১ কোটি ৩৬ লক্ষ। ৫ কোটি ১০ লক্ষ মাইনাস ১ কোটি ৩৬ লক্ষ অর্থাৎ ৩ কোটি ৭৪ লক্ষ মিসিং বা আনুমানিক ৩৭ মিলিয়ন।

আরও একটি হিসাব আছে। গেজেট আকারে প্রকাশিত শত্রু বা অর্পিত সম্পত্তির 'ক' ও 'খ' তালিকা হিন্দু মিসিং-এর কথা বলছে। হিন্দু নাই বলেই তো শত্রু সম্পত্তি? বর্তমানে বিশাল শত্রু সম্পত্তির পরিমাণের সাথে মিসিং হিন্দু'র একটি সংখ্যা পাওয়া যায় বইকি? সেই সংখ্যাটি কত? দৈনিক যুগশঙ্খ

২৩ জুলাই ব্যানার হেডিং করেছে, ৩ কোটি ৭০ লক্ষ সংখ্যালঘু ভারতে আছেন। পত্রিকাটি কলকাতা, শিলচর, গুয়াহাটি থেকে একযোগে প্রকাশিত হয়। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো পরিসংখ্যান বলছে, ১৯০১ সালে বাংলাদেশ নামক ভূখণ্ডে মুসলমান জনসংখ্যা ছিল ১ কোটি ৯১ লক্ষ ১৩ হাজার। হিন্দু ছিলো ৯৫ লক্ষ ৪৫ হাজার। অর্থাৎ, প্রায় অর্ধেক। ২০১১ সালে বাংলাদেশে মুসলমান জনসংখ্যা ছিল ১১ কোটি ১০ লক্ষ ৭৯ হাজার। হিন্দু ১ কোটি ১৩ লক্ষ ৭৯ হাজার, কিন্তু সব হিন্দু থাকলে এটি হওয়া উচিত ছিল ৫ কোটি। বাকি হিন্দু কোথায়? ৪ কোটি মিসিং?



প্রিয়া সাহা তার বক্তব্যে দেশে থাকার যে ইচ্ছে ব্যক্ত করেছেন তা প্রতিটি সংখ্যালঘুর মনের কথা এবং এটি অনন্য দেশপ্রেম। অথচ প্রিয়া সাহার বিরুদ্ধে পুরো দেশ ঝাঁপিয়ে পড়েছে। বলা হচ্ছে, প্রিয়া সাহা নালিশ করেছেন। 'নালিশ' তো আমাদের রাজনৈতিক সংস্কৃতি। অতীতে সব নেতা-নেত্রী এসে ওয়াশিংটনে নালিশ করেছেন। দিল্লিতে গিয়ে নালিশ করেছেন। এখনো করেন। তবে প্রিয়া সাহা একেবারে খোদ মার্কিন প্রেসিডেন্টের কাছে পৌঁছে গেছেন। এটি অসহ্য। প্রিয়া যা বলেছেন, তা সত্য। বাংলাদেশে সংখ্যালঘু সমস্যা হিমালয়পর্বতসম, সময় এসেছে এই সমস্যা সমাধানে সচেষ্ট হওয়ার। দোষী প্রিয়া সাহা নন, দোষী জোটবদ্ধ প্রতিবাদকারীরা। প্রিয়া সাহা ইস্যুতে বাংলাদেশ সংখ্যালঘু ও মুসলমান জনগোষ্ঠী পরিষ্কার দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে গেছে। প্রিয়া সাহার ঘটনায় সাধারণ মানুষের ক্ষোভ উস্কে দিয়েছেন উপর তলার নেতারা বা তথাকথিত প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীরা। একশ্রেণীর মিডিয়া মূলত তথ্যনির্ভর রিপোর্টিং'র বদলে প্রিয়া সাহার বিরুদ্ধে প্রোপাগান্ডা চালিয়েছে এবং এতে মৌলবাদী শক্তি উৎসাহিত হয়েছে। প্রেসের একাংশ প্রিয়া সাহার বক্তব্যের 'ডিজেপিয়ার' শব্দের হাস্যকর বাংলা করেছে 'গুম'। প্রিয়া সাহার স্বামীর নাম মলয় সাহা। তিনি দুর্নীতি দমন কমিশনের একজন কর্মকর্তা। তাঁর দুই মেয়ে আমেরিকায় স্কলারশিপ নিয়ে পড়াশোনা করছেন। মিডিয়ার একাংশ মলয় সাহার বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। তারা প্রিয়া সাহার পরিবারের ছবি প্রকাশ করেন এবং তাঁর বাড়ির ঠিকানা দিয়ে দেন। এরফলে মলয় সাহার বাড়ির সামনে বিক্ষোভ হয় এবং বিক্ষোভকারীরা গেটভেঙে বাড়িতে ঢোকার চেষ্টার করে। ঢুকতে না পেরে তাঁর বাড়ি সিলগালা মেরে দেওয়ার হুমকি দিয়ে যায়। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক তখন কোথায় ছিল কে জানে? প্রিয়া সাহার স্বামী মলয় সাহা ঢাকায় অবস্থান করছেন। সাবেক প্রধান বিচারপতি সুরেন্দ্র কুমার সিনহাকে যেভাবে দেশত্যাগে বাধ্য করা হয়েছিলো, শোনা যাচ্ছে তাঁর ভাগ্যেও তাই ঘটতে যাচ্ছে। তাঁকে দুর্নীতিবাজ বানাতে ইতিমধ্যে যুক্তরাষ্ট্রে তাঁর বাড়িঘর আছে কিনা সেই খোঁজ শুরু হয়েছে। একেই হয়তো বলে, 'সতীর পুণ্যে পতির পুণ্য'!

হেফাজত-ই-ইসলামের প্রধান শফি হুজুর, যিনি মহিলাদের তেঁতুলের তুলনা করে 'তেঁতুল হুজুর' নামে সমধিক পরিচিত প্রিয়া সাহার বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করে আন্দোলনের হুমকি দিয়েছেন। জামাতে ইসলাম প্রিয়া সাহার বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে। সরকারি দলের নেতারা দায়িত্বহীন কথাবার্তা বলেছেন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী প্রথমে বলেছেন, প্রিয়া সাহার নালিশ উদ্দেশ্যমূলক। পরে বলেছেন, প্রিয়ার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রণালয় প্রিয়া সাহার বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহী মামলার কথা বলেছে। পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন, প্রিয়া সাহার বক্তব্য মিথ্যা এবং বিশেষ মতলবে। উপ-পরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন, নালিশ খতিয়ে দেখা হবে। হেভিওয়েট মন্ত্রী ও ক্ষমতাসীন আওয়ামি লিগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের প্রথমে বলেছেন, প্রিয়া সাহার বক্তব্য সাম্প্রদায়িক শক্তিকে উৎসাহিত করবে। পরে বলেছেন, প্রিয়া সাহা দেশদ্রোহী। এরপর প্রধানমন্ত্রী নির্দেশ দেন, মামলা হবে না। প্রিয়া সাহার কথা শুনতে হবে। ওবায়দুল কাদের প্রেসকে একথা জানান। আইনমন্ত্রী বলেন, এসব ছোটোখাটো বিষয় নিয়ে রাষ্ট্রদ্রোহী মামলা ঠিক নয়। কিন্তু প্রিয়া সাহার সামান্য ছোটখাট বক্তব্য নিয়ে মৌলবাদীরা যে হুমকি-ধমকি দিচ্ছেন তা কিন্তু খুব ছোট্ট নয়। তবে প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশকে স্বাগত জানিয়ে আশা ব্যক্ত করা যায় যে, মৌলবাদী শক্তি প্রিয়া সাহার বিরুদ্ধে যে সাম্প্রদায়িক আগুন লাগাতে চেষ্টা করেছে এতে হয়তো কিছুটা তা চাপা পড়তে পারে। ধন্যবাদ, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে। হয়তো এরই প্রেক্ষিতে ইতিমধ্যে দু'জন সাধারণ নাগরিক প্রিয়া সাহার বিরুদ্ধে যে 'রাষ্ট্রদ্রোহে'র মামলা এনেছিলেন, মহামান্য আদালত তা প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই খারিজ করে দেন। প্রিয়া সাহার বিরুদ্ধে দায়েরকৃত অন্য মামলাগুলোর ভবিষ্যৎ আশা করা যায় একই হবে। এরই মধ্যে প্রিয়া সাহার গ্রামের বাড়িতে তার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ করানো হয়েছে। তাঁর এনিজও'র পঁচিশ কর্মকর্তা পদত্যাগ করেছেন। এ প্রসঙ্গে তসলিমা নাসরিন বলেছেন ঃ প্রিয়া সাহা ভয়াবহতার কথা কমই বলেছেন। ফেসবুকে তিনি লিখেন, মাপা সময়, ভয়াবহতার বর্ণনা করার সময় তিনি পাননি। লাখকে মিলিয়ন বলেছেন নাকি মিসিং, ডিসোপিয়ার্ড বলেছেন, সেটি বড়োকথা নয়। বড়োকথা হলো, হিন্দুদের বিরুদ্ধে বৈষম্য বাংলাদেশে চলছে, নির্যাতন চলছেই। সেই কারণে নিরাপত্তার অভাবে হিন্দুরা দেশ ছাড়ছে। এটা মানুষ জানুক, হাসিনা এসেও যে সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা দেননি, এটাও মানুষ জানুক। তিনি আরও বলেছেন, মানুষ যে দেশ ছাড়ছে এর প্রমাণ তো দেশেই। প্রিয়া সাহা যদি নির্ভুল পরিসংখ্যান দিতেন ১৯৪৭ সালে হিন্দু জনসংখ্যা ছিলো ২৯.৭% ২০১১ সালে তা নেমে এসেছে ৯.৭% -তে, তাহলেই কি খুব চমৎকার শোনাতো? মোটেই না। জাতীয় মানবধিকার কমিশনের সাবেক চেয়ারম্যান হঃ মিজানুর রহমান জার্মানির ডয়চে ভেল-কে বলেছেন ঃ 'আমাদের রিঅ্যাকশনগুলো হঠকারিতার শামিল হয়ে যাচ্ছে। এত বেশি রিঅ্যাকশন দেখানোর কিছু নেই। ঐক্য পরিষদ নেতা কাজল দেবনাথ বলেছেন, মামলা তো হতেই পারে, তবে এতে দুর্গন্ধ ছড়াবে। তিনিই আবার ঠ্যালায় পরে একাত্তর টিভিতে অন্য সুর গেয়েছেন। উইমেন চ্যাপ্টারে একজন মঞ্জুরুল হক লিখেছেন, 'প্রিয়া সাহা'র ওপর সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠী ও রাষ্ট্রের ক্ষোভ যেন অন্যদের ঘাড়ে না পড়ে। সমস্যাটা এখানেই, রাষ্ট্রের ক্ষোভ থাকলে প্রিয়া সাহা দেশে ফিরে যাবেন কী করে?

(লেখক নিউইয়র্ক স্থিত প্রবাসী বাঙ্গালি)

জিএসএলভি মার্ক-৩-এম-১ উৎক্ষেপণ যানের সাহায্যে চন্দ্রযান-২ মহাকাশযানের সফল উৎক্ষেপণ

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ ভারতের ভূ-সমালয় উপগ্রহ উৎক্ষেপণযান জিএসএলভি মার্ক-৩ এম-১-এর সাহায্যে ৩ হাজার ৮৪০ কিলোগ্রাম ওজনবিশিষ্ট চন্দ্রযান-২ মহাকাশযানটিকে সাফল্যের সঙ্গে পৃথিবীর কক্ষপথে স্থাপন করা হয়েছে। অন্ধ্রপ্রদেশের শ্রীহরিকোটায় সতীশ ধওয়ান মহাকাশ



কেন্দ্রে দ্বিতীয় উৎক্ষেপণস্থল থেকে জিএসএলভি মার্ক-৩-এম-১-এর উৎক্ষেপণ করা হয়। পৃথিবীর কক্ষপথে চন্দ্রযান-২ পৌঁছে দেওয়ার সময় পৃথিবীর নিকটতম বিন্দু ১৬৯.৭ কিলোমিটার এবং পৃথিবীর থেকে দূরবর্তী বিন্দু ৪৫ হাজার ৭৪৫ কিলোমিটার ব্যবধানে অবস্থান করে পৃথিবীকে পরিক্রমা করছে।

জিএসএলভি মার্ক-৩-এম-১ উৎক্ষেপণের প্রায় ১৬ মিনিট ১৪ সেকেন্ড পর চন্দ্রযান-২ মহাকাশযানটিকে ডিম্বাকৃতি কক্ষপথে পৌঁছে দেওয়া হয়। উৎক্ষেপণযান থেকে মহাকাশযানটি বিচ্ছিন্ন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মহাকাশযানটির সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদন প্যানেলটি সক্রিয় হয়ে যায়। ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা ইসরোর ব্যাঙ্গালুরুতে স্থাপিত টেলিমিটার, ট্রাকিং ও কমান্ড নেটওয়ার্ক ব্যবস্থার মাধ্যমে মহাকাশযানটির দায়িত্ব সাফল্যের সঙ্গে গ্রহণ করে হয়।

ইসরো'র চেয়ারম্যান ড. কে সিভান এই অভিযানের সঙ্গে যুক্ত সংশ্লিষ্ট সকলকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন, ভারতে মহাকাশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রে আজ এক ঐতিহাসিক দিন। আমি অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, জিএসএলভি মার্ক-৩-এম-১ সাফল্যের সঙ্গে চন্দ্রযান-২'কে ৬ হাজার কিলোমিটার বেশি কক্ষপথে সাফল্যের সঙ্গে পৌঁছে দিয়েছে। চন্দ্র অভিযান এবং চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে অবতরণের দিক থেকে আজ ভারতের এক ঐতিহাসিক যাত্রার সূচনা হলো। চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে অনাবিষ্কৃত বিভিন্ন বিষয়ে খোঁজ পেতেই এই অভিযান। গত ১৫ জুলাই ইসরোর বিজ্ঞানীরা উৎক্ষেপণযানে কিছু প্রযুক্তিগত ত্রুটি খুঁজে পান। এরপর, বৈজ্ঞানিক দলটি ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই যাবতীয় প্রযুক্তিগত ত্রুটি সংশোধন করে ফেলেন। পরবর্তী দেড় দিন ধরে ত্রুটি ঠিকভাবে সংশোধন হয়েছে কিনা, তা নিয়ে যাবতীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানো হয়। সফল উৎক্ষেপণের পর আজ ইসরো অসাধারণ সাফল্য অর্জন করল।

চন্দ্রযান-২, চাঁদে ভারতের দ্বিতীয় অভিযান। এই যানে সম্পূর্ণ দেশীয় প্রযুক্তিতে নির্মিত অরবিটর, ল্যান্ডার (বিক্রম) এবং রোভার (প্রজ্ঞান) রয়েছে। ল্যান্ডার বিক্রমের সঙ্গে রোভার প্রজ্ঞানকে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। এই অভিযানের উদ্দেশ্য হলো— চন্দ্র অভিযানের সক্ষমতার সঙ্গে যুক্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রযুক্তিগুলির আরও মানোন্নয়ন এবং সেগুলি জনসমক্ষে তুলে ধরা। বিজ্ঞানের দিক থেকে এই অভিযানের উদ্দেশ্য হলো চাঁদের ভৌগোলিক স্থিতি, খনিজ সম্পদ, ভূপৃষ্ঠের রাসায়নিক গঠন, তাপ-ভৌগোলিক চরিত্র এবং সেখানকার বাতাবরণ সম্বন্ধে বিস্তারিত সমীক্ষা চালিয়ে আরও তথ্য সংগ্রহ করা। পৃথিবীর কক্ষপথ ছাড়িয়ে চাঁদের কক্ষপথে প্রবেশের পর চন্দ্রযান-২-এর প্রপালসন সিস্টেম চালু করে দেওয়া হবে। গতি নিয়ন্ত্রণ করতেই এ ধরনের ব্যবস্থা চন্দ্রযান-২-এর সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। এরপর, চাঁদের কক্ষপথে পরিক্রমা করতে করতে সেখানকার ছবি সংগ্রহ করবে। একইভাবে, অর্বিটর থেকে ল্যান্ডার পৃথক হয়ে যাবে। পৃথক হওয়ার পর ল্যান্ডার চাঁদের দক্ষিণ মেরু অঞ্চলে আগামী ৭ সেপ্টেম্বর অবতরণ করবে। চন্দ্রযান-২-এর সঙ্গে পাঠানো রোভার চাঁদের ভূ-পৃষ্ঠে ১ চন্দ্রদিবস (পৃথিবীর ১৪ দিনের সমান) ধরে নানারকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাবে। তবে, অর্বিটরের যাবতীয় কাজকর্ম আগামী ১ বছর চালু থাকবে। চাঁদের উৎস ও ক্রমবিকাশ সম্পর্কে আরও ভালো ধারণা পেতে চন্দ্রযান-২-এ একাধিক যন্ত্রপাতি রয়েছে। চন্দ্র অভিযানের মতো কর্মসূচির ক্ষেত্রে চন্দ্রযান-২-এর সফল উৎক্ষেপণ এক উল্লেখযোগ্য মাইলফলক। শ্রীহরিকোটার দর্শক গ্যালারি থেকে ৭ হাজার ৫০০ জন উৎক্ষেপণ সরাসরি প্রত্যক্ষ করেন। ▮

ফুটবলের আঁতুড়ঘরে রাজনীতির ঘোলাজল

শিউলি দত্ত

দীর্ঘদিন ধরেই অ-লাভজনক ক্রীড়া সংস্থার নাম ইন্ডিয়ান ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন। যার প্রথাগত নাম আই.এফ.এ.। পশ্চিমবঙ্গের ফুটবলের নিয়ামক সংস্থার জীর্ণ দশা কাটানোর সদিচ্ছা নিয়ে সংশয় থেকেই গেছে। সম্প্রতি প্রায় সাত কোটি টাকার দেনার বোঝা মাথায় রেখেই আইএফএ সচিব পদ থেকে সরে গেছেন এক সময়ের ডাকসাইটে শিল্পপতি উৎপল গাঙ্গুলি। নতুন সচিব হয়েছেন জয়দীপ মুখার্জি। আর এই নির্বাচন ঘিরেই ময়দান আরও একবার দেখল ঘোলা জলকে আরও কীভাবে ঘুলিয়ে খেতে হয়। প্রথমে ঠিক ছিল সচিব পদের নির্বাচন হবে। সেইমতো প্রস্তুতি শুরু হয়। সি.এ.বি. এবং বিসিসিআই প্রশাসনের সঙ্গে একসময় জড়িয়ে থাকা বিশ্বরূপ দে উঠে আসেন আলোচনার কেন্দ্রে। এরই মাঝে আপাদমস্তক ভদ্রলোক উৎপল গাঙ্গুলি জানিয়ে দেন তিনি নিজে থেকেই সরে যেতে চান। এই ডামাডোল তাঁর অপসন্দ। এমনিতেও আইএফএ-র অন্দরে কান পাতলে শোনা যায় এত খারাপ অর্থনৈতিক অবস্থায় থাকা একটা সংস্থার দায়িত্ব যে তিনি নিতে চেয়েছিলেন এটাই অনেক। অনেকেই মনে করেন যে সংস্থায় কর্মচারীদের নিয়মিত বেতন হয় না। চরম আর্থিক দুর্দশা চলছে, এমন এক ধুঁকতে থাকা সংস্থার পাশে প্রায়ই গৌরী সেন হয়ে পাশে দাঁড়াতেন উৎপল গাঙ্গুলি। অনেক সময়ই অনেক টুর্নামেন্টের স্পনসর জোগাড় হয়নি। তিনি ঢাল হয়ে দাঁড়িয়েছেন পাশে। কর্মচারীদের বেতন সমস্যা থেকে অনেক ছোটো-বড়ো আর্থিক সমস্যায় নিজের পকেট থেকেই টাকা দিয়েছেন তিনি। এহেন উৎপল গাঙ্গুলিকে সরাতে সংস্থার ভিতরেই শুরু হয়েছিল চক্রান্ত। যার মদত দিয়েছেন একশ্রেণীর কর্মচারী। আর সেটাই আঘাত দিয়েছিল আপাত ভদ্রলোক উৎপল গাঙ্গুলীকে। একসময়ে নিজে হকি খেলেছেন রাজ্যস্তরে। নিজের খেলোয়াড়ি মানসিকতা থেকেই তাই



আই এফএ-র প্রাক্তন সচিব উৎপল গাঙ্গুলি।

তিনি কারোকে কিছু বুঝতেই দেননি। অথচ সভা করে, গোপন মিটিং করে আবার প্রকাশ্য ঘোষণা করে যাঁকে স্বপ্ন দেখাল ময়দানে দীর্ঘদিন রাজত্ব চালিয়ে যাওয়া এক পরিবার, তাঁরাই আবার গোপন মিটিং করে কাঁচি চালিয়ে ছেঁটে ফেললেন বিশ্বরূপ বাবুকে। অর্থাৎ শিখণ্ডী করা হলো বিশ্বরূপ দেখে। যেটা বুঝতে অনেকটা সময় নিয়ে ফেললেন এই পোড় খাওয়া প্রশাসক। বিশ্বরূপবাবুকে সামনে রেখে উৎপলবাবুকে সরে যেতে বাধ্য করা হলো। তারপর সেই পরিবারের ঘনিষ্ঠ জয়দীপ মুখার্জিকে বসিয়ে দেওয়া হলো আইএফএ সচিব পদে। আর বিশ্বরূপ দে-কে বোঝাতে ময়দানে নেমে পড়লেন মুখ্যমন্ত্রীর দাদা আইএফএ-র সভাপতি অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়। কারণ বিশ্বরূপ দে ততদিনে ভোটের লড়াইতে নামবেন বলে প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছিলেন। কাজেই তাঁকে সরাসরি ভোট রাজনীতি থেকে সরানোটা খুব সহজ হতো বলে মনে করা যাচ্ছে না। এদিকে ময়দানের বিভিন্ন খেলাধুলার প্রশাসনে থাকা পরিবার এবং বিশ্বরূপ দে উভয়ই শাসক গোষ্ঠীর খুবই কাছের লোক। ফলে সরাসরি সংঘাত প্রকাশ্যে আসার আগেই সেটা মেটানোর প্রয়োজন ছিল রাজ্যের বর্তমান শাসক গোষ্ঠীর কাছে। এমনিতেই লোকসভা নির্বাচনে অনেকটাই মাটি আলগা হয়েছে তাদের। তাই এই যুদ্ধ থামাতে সরাসরি ব্যাট করতে নামতে হলো অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়কে। ফলস্বরূপ আই এফ এ-র নির্বাচনের কিছুদিন আগে বিশ্বরূপ দে এক সাংবাদিক বৈঠকে জানিয়ে দিলেন তিনি নির্বাচনে লড়তে চান না। কারণ হিসাবে তিনি জানালেন সচিব পদ তাঁকে দেওয়া হবে বলেই এই নির্বাচনে তাঁকে আনা হয়েছিল। তিনি বুঝতে পারেননি যে তাঁকে সামনে রেখে উৎপলবাবুকে এক প্রকার সরে যেতে বাধ্য করা হবে। তাই তাঁর মানবিকতাকে তিনি বিসর্জন দিতে চান না বলেই এই সিদ্ধান্ত। অদ্ভুতভাবে সেই সাংবাদিক সম্মেলনে বিশ্বরূপবাবু তাঁর পাশে বসিয়েছিলেন বর্তমান আইএফএ সভাপতি অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়কে।

ময়দানে কান পাতলে এ কথাও শোনা যাচ্ছে বিশ্বরূপবাবু দক্ষ ক্রীড়া প্রশাসক। যাঁকে ইচ্ছামতো অঙ্গুলি হেলনে চালানো যাবে না। আর সেটা বুঝতে পেরেই ময়দানে পরিবার তন্ত্র চালানো কর্মকর্তা সরাসরি আসরে নেমে পড়েন। এবং জয়দীপ মুখার্জি যাঁকে ময়দানের কটা লোক সেভাবে চেনে অন্তত খেলাধুলার জগতে সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ থাকলেও তাঁকেই সচিব পদে বসাতে উঠে পড়ে লেগে পড়েন ওই শীর্ষকর্তা। জয়দীপবাবুকে সিনেমার জগৎ চিনলেও সরাসরি খেলাধুলার সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ কোথায়? এ প্রশ্ন উঠতেই পারে।

তবে জয়দীপবাবুর সামনে সবথেকে বড়ো চ্যালেঞ্জ প্রায় সাত কোটির দেনায় ডুবে থাকা আই এফ এ-কে কীভাবে দেনা মুক্ত করতে পারেন তিনি? আর নির্বাচনে শেষ মুহূর্তে সরে দাঁড়ানো বিশ্বরূপবাবুর একটা প্রশ্ন কিন্তু খোঁচাবিদ্ধ পাখির মতো অনেকেরই প্রশ্ন। আই এস এলের (ইন্ডিয়ান সুপার লিগ) টিভি স্বত্বের টাকা কেন সমস্ত রাজ্য সংস্থার মধ্যে বণ্টন হবে না?

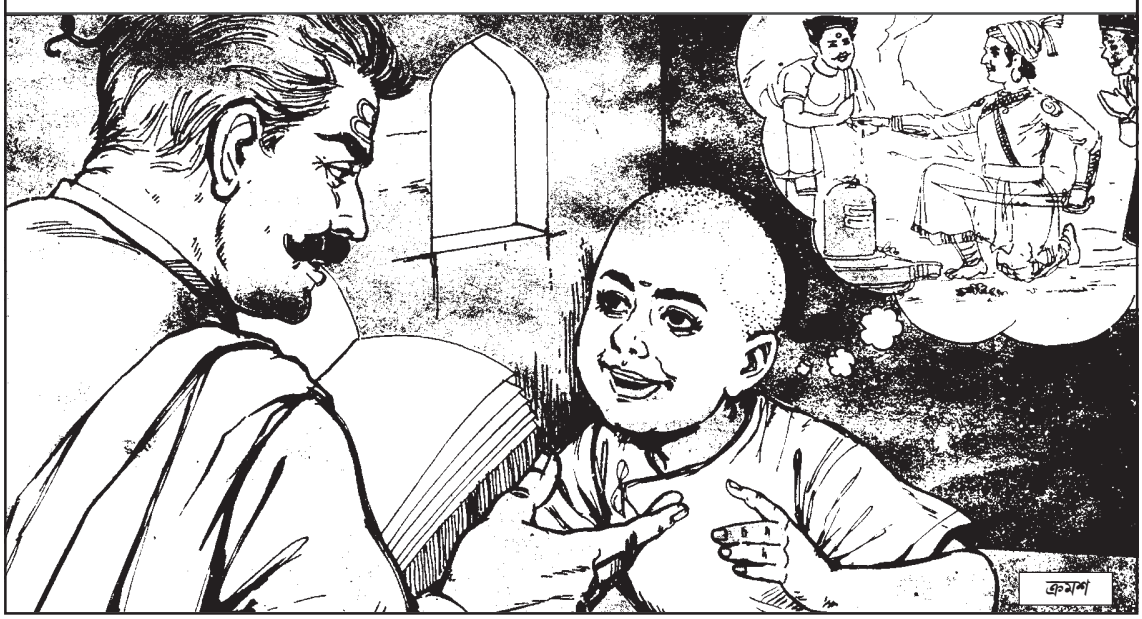
এই প্রশ্ন কী এআইএফএফ-এর সভায় তুলতে পারবেন জয়দীপবাবু? সেই জোর কি তাঁর থাকবে? কারণ যাঁর অনুকম্পায় তিনি রাজ্যসংস্থার চেয়ারে বসলেন তিনিই তো এআইএফএফেরও প্রতিনিধিত্ব করেন। জয়দীপ মুখার্জির মতো নতুন লোকেরা আসুন ক্ষতি নেই, কিন্তু এ রাজ্যের ফুটবলকে নিজের হারিয়ে যাওয়া জায়গা ফেরাতে আসুন। রাজনীতির মাঝে পড়ে ফুটবল ও ফুটবলারদেরকে হারিয়ে দিতে নয়। এই সব কর্মকর্তাদের বুঝতে হবে যদি গাছই না থাকল তা হলে ফল পাবেন কোথায়? গাছ উপড়ে দিয়ে একেবারে সব ফল খেয়ে ফেলা এবার বন্ধ হোক। ■

।। চিত্রকথা।। ডাক্তার হেডগেওয়ার।। ১।।

শক সংবৎ ১৮১১-র বর্ষ প্রতিপদার পবিত্র দিন, ১৮৮৯-র এপ্রিলে নাগপুরে বেদমূর্তি পণ্ডিত বলিরাম পন্ত হেডগেওয়ার একটি পুত্রসন্তান লাভ করলেন। ছেলেটির নাম রাখা হলো কেশব।



পাঁচ বছর বয়স হলো কেশবের। কাকা আবাজী হেডগেওয়ার তাকে শিবাজীর গল্প বলেন আর সে মুগ্ধ হয়ে সেসব শোনে।



ব্যাঙ্ক বেসরকারিকরণ সরকারের অ্যাজেন্ডা নয়

সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়

১৯৬১ সালে জুলাই মাসে প্রথম দফায় দেশের বড়ো বড়ো লোকেদের নিয়ন্ত্রণে থাকা ১৪টি ব্যাঙ্ককে সরকারের অধীনে এনেছিলেন ইন্দিরা গান্ধী। সেই ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের ৫০ বছর পূর্ণ হলো। সেই সময় কিন্তু জাতীয়করণের সঙ্গে Social Control of Bank কথাটিও জোড়া ছিল। দেশের অভ্যন্তরে পরাধীন ভারতের ৫৬০টি রাজবংশের বংশধররা Privy Purse বা রাজন্যভাতা তখনও পেতেন। রাজবাড়ির মতো এদের অনেকেরই হাতে কিছু কিছু ব্যাঙ্কও ছিল। আজকের স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ত্রাভাঙ্কোর বিকানীর ও জয়পুর, স্টেট ব্যাঙ্ক অব পাতিয়ালা বা ইন্দোর ইত্যাদি ছিল সেই রাজন্যদের। একই সঙ্গে পরাধীন অবস্থা থেকেই দেশীয় প্রতিষ্ঠিত শিল্পপতিরা যেমন— টাটা, বিড়লা, গোয়েঙ্কা, গাইকোয়াড়রাও এঁদের ব্যবসার কাজে টাকার জোগান বাড়াতে নিজস্ব ব্যাঙ্ক ব্যবসাও খুলেছিলেন। এই ব্যাঙ্কগুলি অর্থনৈতিকভাবে শক্তপোক্ত হলেও মূলত প্রভুর ইচ্ছাধীন হয়েই কাজ করতে বাধ্য হতো। সাধারণ মানুষ বিশেষ ঋণ পেতেন না। টাটার ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া, বিড়লার ইউনাইটেড কর্মার্শিয়াল, বরোদার গাইকোয়াড়দের ব্যাঙ্ক অব বরোদা এমনই কিছু নাম। এঁদের দেখা দেখি অনেকেই কাঁচা টাকার গন্ধে টুকটাক ব্যাঙ্ক খুলে বসতে শুরু করেন। ৬০-এর দশকে প্রায়শই ব্যাঙ্ক ফেল হয়েছে। কথাটা আকছার শোনা যেত। পরিসংখ্যান থেকে পাওয়া যায় স্বাধীনতার পর থেকে ১৯৬৮ সাল পর্যন্ত যারা ভারতে ৬৬৫টি ব্যাঙ্ক লাটে ওঠে। গড়ে বছরে ৩০টি। তদানীন্তন অর্থমন্ত্রী মোরারজীভাই দেশাই বহু বিধি নিষেধের প্রয়োগে ১৯৬৫-তে চালু ব্যাঙ্কের সংখ্যাটাকে ৬৮-তে নামিয়ে অনেন। তবুও আশঙ্কা থেকেই যায় কেননা এর সঙ্গে ব্যক্তিগত নিয়ন্ত্রণ ও অর্থলিপ্সা সরাসরি জড়িত ছিল।

প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ১৯৬৬-তে ক্ষমতাসীন হয়ে এই বিষয়টার দিকে নজর রাখছিলেন। এই টাকার ভাণ্ডার সরকারের হাতে নিয়ে আসা ও ব্যাঙ্ক উঠে যাওয়ার অনিশ্চয়তা থেকে জনতাকে রেহাই দেওয়ার দু'মুখো কৌশল ইন্দিরার মাথায় আসে। তবে জাতীয়করণ বা সরাসরি টেক ওভারের সংজ্ঞায় 'When a Country's Government seizes the assets of corporation or resources without paying for those assets' তা তিনি করেননি। শিল্পপতিদের চটাতে চাননি। জাতীয়করণ বাবদ মালিকদের তিনি ৮০.৪৭ কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ হিসেবে দিয়েছিলেন (এর পর মামলা হয় সে অঙ্ক বিতর্কিত হয় সে ভিন্ন কথা)। নির্মোহ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখলে সেই সময় জাতীয়করণ দেশের অর্থনীতির প্রসারে সাহায্য করেছিল। বিমুদ্রীকরণের ফলে যেমন সমস্ত কুক্ষিগত অর্থ ব্যাঙ্কিং প্রণালীতে ঢুকে দেশের মূল ধারার শরিক হয় তেমনি ব্যক্তিবর্গের বিপুল গচ্ছিত অর্থ (যার মধ্যে সাধারণ মানুষেরও বহু টাকা ছিল) সরকারের নিয়ন্ত্রণে চলে আসে। ব্যক্তি মালিকানার ব্যাঙ্কগুলি ৫০ বছর আগে কৃষিক্ষেত্রে কোনো ঋণ দিত না বললেই হয়। তখন চাষিরা মহাজনের হাতে কী দুর্দশায় পড়ত তা আমরা গল্প-উপন্যাস-নাটক- চলচ্চিত্রে প্রত্যক্ষ করেছি। জাতীয়করণের সময় কৃষি, পরিবহণ ও সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে ঋণের পরিমাণ ছিল মাত্র ৪ শতাংশ। গ্রামাঞ্চলে ব্যাঙ্ক ব্যবস্থারই বিশেষ অস্তিত্ব ছিল না। তখনও মানি অর্ডারেরই রমরমা। এখন আর টি জি এস- এ-১ মিনিটে টাকা হাত বদলায়। আজকের ভারতে ব্যাঙ্কের প্রতি তিনটি শাখার একটি গ্রামাঞ্চলে। এবং বাজারে ২৭টি সরকারি ব্যাঙ্ক থাকায় প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলেও মানুষ তাঁর পছন্দমতো ব্যাঙ্কে টাকা রাখার সুযোগ পান। এই প্রচুর পরিমাণ শাখা অফিস খোলার ও হরাইজেন্টাল বিস্তারের ফলে গোটা ৭০ দশক ব্যাপী প্রচুর চাকরি তৈরি হয়।

ক্রমাগত বিস্তারের ফলে বিগত ৫০ বছরে সরকারি ব্যাঙ্ক মহীরুহে রূপান্তরিত হয়েছে। অর্থনীতির প্রতিটি অলিতে গলিতে তার অবাধ বিচরণ। সরকারের যে কোনো প্রকল্প এই সরকারি ব্যাঙ্কগুলির অংশগ্রহণ ছাড়া



ফঃ ৬

অস্তিত্বহীন। মোদীজীর 'স্বচ্ছ ভারত প্রকল্পে' দেশব্যাপী শৌচাগার নির্মাণের বিশাল কর্মকাণ্ড ব্যাঙ্কের সক্রিয় যোগদান ছাড়া অসম্ভব ছিল। সারাদেশে প্রায় ১ লক্ষ ২০ হাজার শাখার জাল ও পরিষেবাকে (সেটা সব ক্ষেত্রে আশানুরূপ হয়তো নয়) অস্বীকার করার শক্তি কোনো রাজ্য সরকারেরই নেই। মুদ্রা যোজনার ২০ কোটি মানুষ যে ব্যাঙ্ক ঋণ পেয়েছে তার গরিষ্ঠাংশ গ্রামে। হ্যাঁ, এর ১৭ হাজার কোটি টাকা ঋণ কঠিন বা অনাদায়ী হওয়ার লক্ষণাক্রান্ত হলেও তা নিতান্তই ভিন্ন প্রশ্ন।

আজকে 'প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা' থেকে 'কিষান বিকাশ যোজনায়' ইতিমধ্যেই ১৫ কোটি চাষিকে বার্ষিক যে ৬ হাজার টাকা করে দেওয়া শুরু হয়েছে এগুলি এই বিশাল ব্যাঙ্কিং নেটওয়ার্কের কারণেই। সরকার এ সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকিবহাল। কেননা সরকারের অর্থ আর তার বিতরণ ক্ষেত্র হিসেবে সরকারি ব্যাঙ্ক সমার্থক। এই ইমারত একদিনে নয়, নানা সরকার ও বিভিন্ন দেশি বিদেশি প্রশিক্ষিত মস্তিষ্ক এর পিছনে তাঁদের অবদান রেখেছেন। একসময় দেশের প্রত্যন্ত বিদ্যুৎহীন গ্রামেও ব্যাঙ্কের কর্মীরা শাখা চালু রেখেছেন। আগে বলা হয়েছে সোশ্যাল কন্ট্রোলের দায় মেটাতে এক সময় ব্যাঙ্ক রবীন্দ্র রচনাবলী থেকে খেলার টিকিটও বিতরণ করেছে। এরই সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া হয় রাজনীতির ইচ্ছাপূরণ। অর্থনীতি সম্পর্কে একটু সজাগ ব্যক্তিরা Integrated Rural Development Programe (IRDP) Self help Group (SHG) MSME প্রকল্পের মাধ্যমে পছন্দের লোককে ঋণ পাইয়ে দেওয়ার কথা ভালোই জানেন। বন্যার সময় নেতা তাঁর লোকগুলির আবেদন ব্যাঙ্কের ম্যানেজারের তোয়াক্কা না করে নিজেই অগ্রাধিকার ঠিক করতেন। যে কোনো ঋণের ক্ষেত্রে গ্রাহককে নির্দেশ দিতেন ঋণ শোধ করতে হবে না। এর সঙ্গে বিশাল অঙ্কের ঋণের ক্ষেত্রে মোদীজীর ভাষায় Tele Banking তো গেড়ে বসেছিল। ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা ও তার সংস্কার কখনই এককালীন কোনো নিদান নয়। এটি একটি on going process। এর ফলেই ৯০-এর দশকে নরসিমা রাও ও ড. মনমোহন সিংহ আন্তর্জাতিক নিয়ম মেনে যে Prudential Accounting চালু করলেন। যে ঋণগ্রহীতা নির্দিষ্ট সময়সীমায় ধার শোধ করেনি তাঁর খাতায় আর সুদ হিসেব করে ঋণের দায় বাড়ানো যাবে না। অর্থাৎ ব্যাঙ্ক সুদ নিতে পারবে না। আজকের বহুশ্রুত এনপিএ বা 'নিকম্মা সম্পদ শব্দটির সেই উৎপত্তি। এর প্রয়োগে ৯২-৯৩ সালে তাবৎ সরকারি ব্যাঙ্ক ক্ষতির মুখে পড়ে। কয়েক বছরে তা কাটিয়ে উঠে ২০০০ থেকেই আবার লাভের মাধ্যমে সরকারকে তারা মোটা টাকা ডিভিডেন্ড হিসেবে দিতে থাকে।

১৯৬৯ সালে অধিগ্রহণের সময় ৫০ কোটি টাকা আমানত আছে এমন ব্যাঙ্কগুলিই কেবল অধিগৃহীত হয়েছিল। পরে ৮০'র দশকে আরও ৬টি ব্যাঙ্কের সরকারিকরণ হয়। সামাজিক নিয়ন্ত্রণের যে কথা বলা হয়েছিল তাতে তখন ব্যাঙ্ককে বাধ্যতামূলকভাবে লাভ করতে হবে এমন কোনো শর্ত ছিল না। ৯০-এর দশকের সংস্কারের সঙ্গে সরকার প্রাইভেট ব্যাঙ্ককেও লাইসেন্স দিতে শুরু করে। এরা মূলত শহরাঞ্চলে বাড়তি সুবিধে ও পারসোনালাইজড ব্যাঙ্কিং দিয়ে বড়ো অঙ্কের লাভ তুলতে থাকেন। সরকার তার অধীন ব্যাঙ্কগুলিকে প্রতিযোগিতা-সক্ষম হওয়ার নির্দেশ দেয়। কিন্তু সরকার এটা জানে গরিবগুর্বো সমেত মধ্যবিত্ত মিলিয়ে দেশের সামগ্রিক সঞ্চয়ের ৭২ শতাংশের নিয়ন্ত্রণ এখনও সরকারি ব্যাঙ্কের অধীনে। স্বভাবগতভাবে অনেকেই সরকারি ব্যাঙ্কগুলিতে গিয়ে বড়ো বড়ো ঝাঁ চকচকে প্রাইভেট HDFC, ICICI, Axis ইত্যাদি ব্যাঙ্কগুলির আওয়াজ দেন কিন্তু কার্যক্ষেত্রে সেখানে পৌঁছতে পারেন না।

এখন এই বিপুল শাখায় বিস্তৃত বিচিত্র পরিষেবা ও মূলত সামাজিক প্রকল্পের সঙ্গে জড়িয়ে থাকায় অনেক ছোটো ব্যাঙ্কই কর্পোরেট ঋণের নাগাল পায় না। একই সঙ্গে আগে বলা সংস্কার প্রক্রিয়ায় প্রায়শই এত কড়াকড়ি হয় যার ফলে অনেক ব্যাঙ্কই সম্প্রতি বিপদাপন্ন পরিস্থিতির মুখে পড়েছে। এর মধ্যে যে-ব্যাঙ্ক আশানুরূপ লাভ করতে পারছে না বা সম্পদের মান খারাপ অর্থাৎ ভবিষ্যতে টাকা দিতে পারবে কিনা সন্দেহ রয়েছে, তাদের নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে Promt Corrective Action (পিসিএ) নিতে হবে বা নিজেকে শোধরাতে হবে। এই সময় তারা নতুন বড়ো ঋণ দিতে না পারলে পদোন্নতি হবে না। সরকারের আর কোনো সেক্টরে এত খবরদারি (খারাপ নয়) নেই। অনুৎপাদক সম্পদ ঘোষণা করার সময়সীমা ভয়ংকর কমিয়ে দেওয়া নিয়ে বিতর্ক বাধায় গভর্নর উর্জিত প্যাটেল বলেছিলেন, ''those banks who need to shrink are shrinking" অর্থাৎ যাদের ব্যর্থ হওয়ার কথা তারাই ব্যর্থ হচ্ছে। সরকার এমন মনোভাব মানেনি। সরকার তার দেশের জনসংযোগ ও অর্থনীতি পরিচালনার এই অর্ধশতাব্দী ব্যাপী গড়ে ওঠা বিশাল ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রেখে সময়োপযোগী করতে ১৫-১৬ থেকে ১৮-১৯ অর্থবর্ষে ধাপে ধাপে ৭০ হাজার কোটি টাকা মূলধনি খাতে দিচ্ছে (অরুণ জেটলি অনুমোদন করে গেছেন)। হ্যাঁ, একটা কথা শাখার আধিক্য রুখতে ও তুলনায় ছোটো কিছু ব্যাঙ্কের অবস্থা নিরাপদ রাখতে Merger & acquisition-এর মাধ্যমে সরকার ইতিমধ্যেই BOB-র সঙ্গে Vijaya Bank-কে মিশিয়ে দিয়েছেন। এই প্রক্রিয়া আরও বাড়তে পারে। খারাপ নয়। আরবিআই ছাড়া ভাইরাল আচার্যের বৌদ্ধিক নিদান Reprivetisation নিয়ে লেখালিখি হচ্ছে। পুনর্বেসরকারিকরণ। কেননা নতুন মূলধন জোগানোর অর্থ 'Throwing good money after bad money' (ভাইরাল আচার্য) (Deputy Governor Deputy Group) কখনই আপ্ত বাক্য হতে পারে না। আর বি আই ছেড়ে তিনি যে মার্কিন দেশে পড়তে গেলেন সেখানেও ২০০৮ সালের বিশ্বের সর্ব বৃহৎ Chase Manhattan সমেত সমগ্র ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা Sub prime Interest crisis-এ (এ আলাদা বৃহৎ বিষয়) পড়ে ডুবতে বসেছিল। সারা বিশ্বে তার নেতিবাচক প্রভাব পড়েছিল। ব্যাঙ্ক বাঁচাতে Federal Reserve-কেই নামতে হয়। মনে রাখতে হবে আমেরিকায় কিন্তু সেনাবাহিনী ছাড়া সবই ব্যক্তি-মালিকানাধীন। ব্যাঙ্কে ১৯৬৯ সালে মূলত নির্দিষ্ট শ্রেণীকে ক্লাস ব্যাঙ্কিং-এর নীতি থেকে কিছুটা অজান্তেই Mass Banking-এর পরিধিতে আনা হয়। আজ মোদীজীর জনধন প্রকল্পের ভারত জোড়া সাফল্য তা প্রমাণ করে দিয়েছে। সেখান থেকে পশ্চাদপসরণ অলীক কল্পনা ও অসম্ভব। কেননা ভারতীয় সরকারি ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা আজ সরকার ও দেশবাসী উভয়েরই Hard Disc-এ চলে গেছে। ■

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের
মুখপত্র
প্রণব
পড়ুন ও পড়ান

মমতা ব্যানার্জি যাত্রাপালার হিন্দু-মান

গুরুপদ বিশ্বাস

পরাধীন ভারতে ঢাকা জেলার বিক্রমপুরে দুয়াল্লি গ্রামে ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দের মে মাসে আমার জন্ম। ১৯৪৬-এর ১৬ আগস্ট 'গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং' এবং ১০ অক্টোবর লক্ষ্মীপূজার দিন পূর্ববঙ্গের নোয়াখালি জেলার 'হিন্দু-নিধন যজ্ঞের' কথা আজও ভুলতে পারিনি।

অবশেষে ১৯৪৭-এর ১৪ আগস্ট রাতের অন্ধকারে (চোর ডাকাতরা রাতেই তাদের চৌর্যবৃত্তি করে) হিন্দুস্থান ভাগ হলো। মুসলমানরা পেল তাদের সাধের পাকিস্তান আর হিন্দুরা পেল ভারত নামে একটি 'ধর্মশালা'। এখানে সবাই থাকবে।

দেশভাগের পর বাধ্য হয়েই পূর্ব পাকিস্তানে থাকতে হয়েছিল। আমাদের গ্রামে মনোরঞ্জনের ব্যবস্থা বলতে যাত্রা ও থিয়েটার ছাড়া কিছুই ছিল না। শীতের সময় কলকাতা থেকে বিভিন্ন যাত্রাদল আমাদের গ্রামে পালাগান গাইতে আসত। কোনো এক রাতে যাত্রা গান শুনতে গিয়েছিলাম। যাত্রা দলের নাম এবং পালাগানের নাম মনে করতে পারছি না। তিনটি চরিত্রের কথা আজও মনে আছে।

চরিত্র তিনটি হলো—'হিন্দুমান', পথিক, ১ম ও ২য়। হিন্দুমান চরিত্রের অভিনেতার বিচিত্র পোশাক। পরিধানে একদিকে ধুতি, অপর দিকে লুঙ্গি। গায়ে একদিকে ফতুয়া, অপর দিকে নামাবলি। মুখমণ্ডলে এক দিকে দাড়ি অপর দিকে দাড়ি, কামানো। যাত্রামঞ্চে পথিক দুজনের আগমনের পর হিন্দুমানের প্রবেশ।

১ম পথিক : তুমি কে?

হিন্দুমান : আমি 'হিন্দুমান'।

১ম পথিক : 'হিন্দুমান' কী? অর্থ বুঝলাম না তো।

হিন্দুমান : হিন্দুর 'হিন্দু' আর মুসলমানের 'মান' এই হলো 'হিন্দু-মান'।

২য় পথিক : তোমার উপাসনা পদ্ধতি কী?

হিন্দুমান : আমার উপাসনা পদ্ধতি হলো, পূজার 'পূ' আর নামাজের 'মাজ' এই নিয়ে হলো 'পূমাজ'।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রতি বছর বাড়িতে কালীপূজা করেন।

আবার ইদের সময় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় হিজাব পরিধান করে রেডরোডে ইদের নামাজ পড়তে যান। ইফ্‌তার পার্টিতেও অংশগ্রহণ করেন।

২০১৬-এর বিধানসভা নির্বাচনে জয়লাভ করে তৃণমূল কংগ্রেস। মন্ত্রী পদে শপথ অনুষ্ঠানে শপথ নেওয়ার সময় প্রত্যেক সদস্য তাঁর নিজ নিজ ধর্মমত অনুসারে হিন্দুরা ঈশ্বরের নামে এবং মুসলমানরা আল্লার নামে শপথ গ্রহণ করেন।

ব্যতিক্রম শুধু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি ঈশ্বরের নামে ও আল্লার নামে শপথ গ্রহণ করেন। ব্রাহ্মণ কন্যা হয়ে তিনি আল্লার নামে শপথ গ্রহণ করলেন কেন?

এই কেনর উত্তর তিনি নিজেই দিয়েছেন গত ২৬ মে এবিপি আনন্দ টিভি চ্যানেলে সাক্ষাৎকারে।

তিনি বলেন, ''আমি ইফতারে যাব, আপনারাও চলুন। হাজারবার যাব। যে গোরু দুধ দেয় তার লাথি খেতেও রাজি। সংখ্যালঘুদের জন্য সবই করা যায়।''

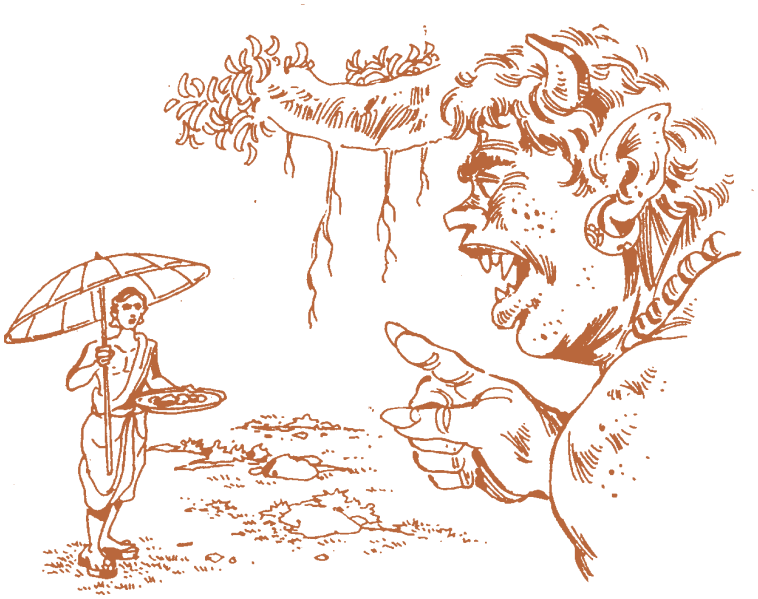
গত ১০ জুন এনআরএস মেডিক্যাল কলেজে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এক 'সম্পদ'-এর পিতার মৃত্যুর পর দিদির সম্পদরা সপরিবারে জুনিয়র ডাক্তারদের পিটালেন। তাতেও দিদির 'সম্পদ'-এর গোসা কমল না। দু' ঘণ্টার মধ্যে ট্যাংরা থেকে দু' লরি গুন্ডা এনে ডাক্তারদের পিটিয়ে ঠাণ্ডা করল। মুচিপাড়া, ইন্টালি থানা এমনকী লালবাজার কিছুই করতে পারল না।

আমার মনে হয়েছে— এই দিদিই সেদিনের যাত্রাপালার হিন্দুমান।



যক্ষের শিক্ষা

বহুকাল আগে বোধিসত্ত্ব একবার বারাণসীতে অত্যন্ত গরিব ব্রাহ্মণের ঘরে জন্ম নিয়েছিলেন। বাবা-মা তাঁর নাম রাখেন সুতনু। বহু কষ্টের মধ্যে সুতনু ধীরে ধীরে বড়ো হতে থাকে। তাঁর বৃদ্ধ পিতা কোনো কাজ করতে পারতেন না। সুতনুই দিনমজুরের কাজ করে বৃদ্ধ মা-বাবা ও নিজের দুমুঠো খাবার জোগাড় করতেন। হঠাৎ একদিন সুতনুর বাবার মৃত্যু হলো। কষ্ট করে মা-ছেলের কোনোভাবে দিন কেটে যেতে লাগল।



সে সময় বারাণসীর রাজা একদিন প্রচুর লোকলশকর নিয়ে শিকার করতে বেরিয়েছেন। একটি হরিণ দেখতে পেয়ে তার পিছু নিলেন রাজা। হরিণটি ছিল খুব চালাক। রাজা তির ছুঁড়লে মরার মতো পড়ে রইল। কিন্তু রাজা কাছে যেতেই ছুটে পালিয়ে গেল। এই দেখে রাজার অনুচররা হাসতে লাগল। রাজা খুব রেগে গেলেন। সংকল্প করলেন হরিণটাকে মারতেই হবে। তিনি আরও জোরে ছুটতে লাগলেন হরিণের পিছনে পিছনে। অবশেষে তাকে ধরে তলোয়ার দিয়ে কেটে দু' টুকরো করলেন। সেই ফাঁকে তাঁর ঘোড়াটি পালিয়ে গেল। একটি লাঠির দু'পাশে হরিণের দু' টুকরো বেঁধে কাঁধে করে চলতে লাগলেন এবং গভীর জঙ্গলে পথ হারিয়ে ফেললেন। বহুক্ষণ ধরে হাঁটতে হাঁটতে তিনি ক্ষুধাতৃষ্ণায় কাতর হয়ে পড়লেন। এক সময় একটি বটগাছের নীচে শুয়ে পড়লেন।

ওই বটগাছে বাস করত এক যক্ষ। সে তপস্যা করে বৈশ্রবর্ণের থেকে বর পেয়েছে, যে এই গাছের নীচে আসবে একমাত্র সেই তার ভক্ষ্য হবে। রাজা গাছের নীচে ঘুমুচ্ছিলেন। যক্ষের বিকট শব্দে রাজার ঘুম ভেঙে গেল। যক্ষ বলল এই গাছে আমি বাস করি। আজ তুমিই আমার খাদ্য হবে। বিস্মিত হয়ে রাজা বললেন, আমি তো তোমার কোনো অন্যায় করিনি। মিছিমিছি কেন আমাকে খেতে চাও? যক্ষ বলল ওসব কথা আমি জানিনে। এই গাছের নীচে যে আসবে সেই হবে আমার আহার। রাজা মনে মনে ভয় পেলেও মুখে সাহস দেখিয়ে বললেন আজ তো আমাকে খাবে আর কাল কী খাবে? তারচেয়ে দু' টুকরো করা হরিণটি খাও, কাল তোমার জন্য অন্য খাবার পাঠাবো।

যক্ষ বলল আমি তোমাকেও খাব আর হরিণটিও খাব। তোমার কথায় বিশ্বাস করি কী করে? রাজা বললেন, আমি বারাণসীর রাজা। মিথ্যা কথা বলি না। তোমার জন্য রোজ খাবার পাঠাবো কথা দিলাম।

যক্ষ বলল আমি বিশ্বাস করে তোমাকে ছেড়ে দিলাম। অন্যথা হলে তোমার রাজ্য ধ্বংস করে ফেলব। রাজা ফিরে এসে চিন্তা করতে লাগলেন কীভাবে বাঁচানো যায় প্রজাদের। রাজা তাঁর মন্ত্রীকে একথা বলতেই মন্ত্রী বললেন রোজ একজন করে কয়েদি পাঠানো হোক যক্ষের খাদ্য হিসেবে। তাই হলো। তারপর এক সময় কয়েদখানা শূন্য হয়ে গেল। রাজা মন্ত্রীকে বললেন এখন উপায়? মন্ত্রী বললেন, রাজ্যে ঢেঁড়া পিটিয়ে দেওয়া হোক, যে যক্ষের খাবার নিয়ে যাবে তাকে এর হাজার স্বর্ণমুদ্রা দেওয়া হবে।

রাজার ঘোষণা শুনে সুতনু ভাবল এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা পেলে তাঁদের অভাব দূর হয়ে যাবে। কিন্তু তাঁর কথা শুনে তাঁর মা খুব কাঁদতে লাগল। মাকে অনেক বুঝিয়ে সুতনু গেলেন রাজদরবারে। রাজাকে বললেন তিনি যক্ষের খাবার নিয়ে যাবেন, কিন্তু তাঁর একজোড়া খড়ম, একটি রাজছত্র, একটি সোনার থালা , একটি তলোয়ার ও একটি খড়্গ চাই। রাজা বললেন, এগুলি দিয়ে তুমি কী করবে? সুতনু বলল, খড়ম পায়ে গেলে যক্ষ বলতে পারবে না যে আমি তার মাটিতে দাঁড়িয়ে আছি। মাথায় ছত্র থাকলে সে বলতে পারবে না আমি তার গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়েছি। শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি কারো জন্য সাধারণ থালায় খাবার নিয়ে যায় না। আর খড়্গ থাকার অর্থ হলো আমি রাজ প্রতিনিধি।

সুতনুর কথামতো রাজা সবই দিলেন। মায়ের কাছে অনুমতি নিয়ে সুতনু বহু খাদ্যসামগ্রী নিয়ে যক্ষের সামনে উপস্থিত হলেন। অদ্ভুত পোশাক পরা লোকটিকে দেখে যক্ষ বলল আজ তাহলে তুমিই আমার খাবার এনেছ। আজ দুজনকেই খাব। সতনু একটুকু ঘাবড়ে না গিয়ে অবশ্যই খেতে পার আমাকে কিন্তু তুমি তাতে ধর্মভ্রষ্ট হবে আর আজ থেকে তোমাকে দেওয়া বৈশ্রবর্ণের বরও নষ্ট হয়ে যাবে।

সুতনুর কথা শুনে ভয় পেয়ে গেল যক্ষ। বলল, ঠিক আছে। তুমি খাবার রেখে চলে যাও, তোমাকে খাব না। সুতনু বুঝতে পারলেন যক্ষ জব্দ হয়েছে। বললেন,তুমি রাজার কাছে চল, তোমার প্রতিদিনের খাবার জোগানোর দায়িত্ব আমি নিলাম। যক্ষ খুশি হয়ে রাজার কাছে এল। রাজা তার প্রতিদিন নিরামিষ খাবারের ব্যবস্থা করলেন আর সুতনু বুদ্ধির পরিচয় পেয়ে রাজা তাঁকে সেনাপতি হিসেবে নিযুক্ত করলেন।

(ছোটোদের জাতকের গল্প থেকে)

ভারতের পথে পথে

কোটা



অতীতের চর্মবতী বা আজকের চম্বল নদীর পূর্বতীরে গড়ে উঠেছে রাজস্থানের কোটা শহর। রাজস্থানের প্রতিটি শহরের মতো প্রাচীর দ্বারা সুরক্ষিত। রয়েছে মাধো সিংহের তৈরি দুর্গ। দুর্গের অভ্যন্তরে রয়েছে সিটি প্যালেস। জয়পুরের আদলে তৈরি হাওয়া মহল, বাদল মহল, অর্দুন মহল, রাজ মহল, জেনানা মহল ইত্যাদি মহলের পর মহল গড়ে উঠেছে। রাজ মহলে রয়েছে রাজসিংহাসন, দেওয়ালময় চিত্রবিচিত্র পৌরাণিক আখ্যান, শিকার কাহিনি, সোনা ও কাঁচের মোজাইক, রুপো ও কাচখচিত সিলিং। দুর্গের পাশে রয়েছে রাও মাধো সিংহ মিউজিয়াম, ভীম মহল, উমেদ ভবন। শহরের দক্ষিণে রয়েছে চম্বল নদীর উপর কোটা ব্যারেজ, চম্বল উদ্যান, কিশোর উদ্যান, দ্বীপ মহল, জগমন্দির, ব্রিজরাজ ভবন প্রাসাদ। আছে এশিয়ার বৃহত্তম সার কারখানা। এখানকার সোনা-রুপো খাচিত কোটা শাড়ি পৃথিবী বিখ্যাত। কোটার আর এক আকর্ষণ হলো দশেরা উৎসব। জাঁকালো মেলা বসে। উৎসব চলে সাতদিন ধরে।

জানো কি?

- রাজ্যের প্রথম গ্রিনসিটি কলকাতার নিউটাউন।
- চন্দ্রযান-২-এর অন্যতম কাণ্ডারি বঙ্গ সন্তান চন্দ্রকান্ত কুমার।
- বিজ্ঞানী চন্দ্রকান্তের বাড়ি গুড়াপের শিবপুর গ্রাম।
- বর্তমান ইসরোর চেয়ারম্যান কে শিবন।
- আগামী অভিযান 'মিশন সূর্য'-এর অন্যতম সদস্য আর এক বঙ্গ সন্তান বিজ্ঞানী দীপঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়।
- সূর্যে পাড়ি দেবে ২০২০ সালে সূর্যযান 'আদিত্য-এল-১'।

ভালো কথা

জল বাঁচাও

জেঠু মাঝে মাঝেই বলে জলের অপর নাম জীবন। কিন্তু মানুষ এক সময় আর জল পাবে না। মাটির তলার জল শেষ হয়ে যাচ্ছে। তাই জলের অপচয় যেন কেউ না করে তা সবসময় খেয়াল রাখে। কল খুলে রেখে মুখ ধোওয়া বা বাসন ধোওয়া এসবে জেঠু খুব রেগে যায়। পাড়ার সবাইকে জেঠু বলেছে বৃষ্টির জল মাটিতে গর্ত করে ভূগর্ভে জলের স্তর বাড়াতে হবে। সেজন্য বাগানে গর্ত করে বাড়ির ছাদের জল সেখানে দেওয়া হচ্ছে। এতে নাকি ভূগর্ভে জল জমা হবে। তা না হলে সব জল নদী দিয়ে বয়ে যাবে। জেঠু বলেছে পৃথিবীতে এখনই জলের হাহাকার শুরু হয়ে গেছে। স্কুলের সব বন্ধুকে আমি ওদের বাড়িতেও এরকম করতে বলেছি। সবাই রাজি হয়েছে।

শুভজিৎ দাস, পঞ্চম শ্রেণী, নামোপাড়া, মানবাজার, পুরুলিয়া।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

শব্দের খেলা

লুপ্ত অক্ষরটি জুড়ে শব্দগঠন করতে হবে	*সঠিক ভাবে সাজাতে হবে*
(১) ক মু রো চ	(১) গ্য ং র স রা সা বৈ
(২) রা পূ মা স	(২) ল ত শ বা নী দ সি

২২ জুলাই সংখ্যার উত্তর

(১) বীরজননী (২) সরবরাহ

২২ জুলাই সংখ্যার উত্তর

(১) সহায়সম্বলহীন (২) সংযোগরক্ষাকারী

উত্তরদাতার নাম

(১) সৌরিন কেশ, তুলসীডাঙ্গা, পূর্ব বর্ধমান। (২) অমৃতা ঘোষ, চাকদহ, নদীয়া। (৩) শ্রাবণী সাহা, মঙ্গলবাড়ি, মালদা। (৪) শ্যামলী সেন, নামোপাড়া, ঝালদা, পুরুলিয়া।

সঠিক উত্তরদাতার নাম পরের সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
হোয়াটস্ অ্যাপ - 8420240584

E-mail : swastika5915@gmail.com

ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।

(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

রাজ্যসভায় আরটিআই সংশোধনী বিল পাশ

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ লোকসভায় পাশ হওয়ার পর আর টি আই সংশোধনী বিল, ২০১৯ রাজ্যসভায় পাশ হয়েছে।

বিলটি রাজ্যসভায় পাশ হওয়া প্রসঙ্গে ড. জিতেন্দ্র সিংহ বলেন, এই আইনের ক্ষমতা খর্ব করার কোনও অভিপ্রায় সরকারের নেই। এমনকী, আইনে প্রদত্ত ক্ষমতাগুলির ক্ষেত্রে কোনওরকম হস্তক্ষেপ না করার ব্যাপারেও মন্ত্রী আশ্বাস দেন। তথ্য কমিশনারদের কাজের মেয়াদ স্থির করা প্রসঙ্গে তিনি স্পষ্ট জানান যে, তথ্য কমিশনারদের কাজের মেয়াদ প্রতি দু' বছর অন্তর পরিবর্তনের ব্যাপারে বিরোধীরা যে অভিযোগ করেছেন, সেকথা বিলের সংশোধনীতে কখনও উল্লেখ করা হয়নি। তিনি জোর দিয়ে বলেন, আইন সংশোধনের ক্ষেত্রে সরকারের হাতে লাগামহীন ক্ষমতা নেই। সরকার সবপক্ষের মতামত বা পরামর্শ শোনার ব্যাপারে আগ্রহী এবং সম্পূর্ণ স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আইনের সংশোধন করা হয়ে থাকে। আর টি আই সংশোধনী বিলটি রাজ্যসভার সিলেক্ট কমিটিতে পাঠানো প্রসঙ্গে মন্ত্রী বলেন, এ ব্যাপারে সভার সদস্যদের মতামত জানানোর বিশেষ অধিকার রয়েছে। তবে, বিলটির গুরুত্ব অনুধাবনের ভিত্তিতে সিলেক্ট কমিটিতে পাঠানো হবে কিনা, তা স্থির হয়ে থাকে।

ড. সিংহ আরও জানান, সরকার সর্বদাই 'সর্বোচ্চ সুশাসন, ন্যূনতম সরকারি হস্তক্ষেপ'--- এই নীতির ওপর গুরুত্ব দিয়েছে। এ প্রসঙ্গে তিনি স্বপ্রত্যয়ন, ইন্টারভিউ প্রথা বাতিল প্রভৃতির মতো সরকারের বিভিন্ন উদ্যোগের কথা উল্লেখ করেন। এই সমস্ত উদ্যোগের উদ্দেশ্যই হলো--- দায়বদ্ধতা বাড়িয়ে সরকারি ব্যবস্থাকে আরও নাগরিক-কেন্দ্রিক করে তোলা। যে কোনও সময় আর টি আই দাখিল করার জন্য সরকার নাগরিকদের সুবিধার্থে মোবাইল অ্যাপ পরিষেবা চালু করেছে। বিগত পাঁচ বছরে অধিকাংশ সরকারি তথ্যই জনসমক্ষে প্রকাশ করা হয়েছে।

আর টি আই বিলে সংশোধন প্রসঙ্গে মন্ত্রী বলেন যে, কেন্দ্রীয় তথ্য কমিশন একটি বিধিবদ্ধ সংস্থা এবং নির্বাচন কমিশন সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান। সেই হেতু, ভারতের নির্বাচন কমিশন এবং কেন্দ্র ও রাজ্যস্তরীয় তথ্য কমিশনগুলির নির্দেশের ক্ষেত্রে ভিন্নতা রয়েছে। তিনি সুস্পষ্টভাবে জানান, আর টি আই বিলে সংশোধনের ক্ষেত্রে সরকারের কোনও অভিপ্রায় নেই, বরং এই সংশোধন আর টি আই-কে আরও সুবিন্যস্ত করতে এবং আইনটিকে আরও শক্তিশালী করতে সাহায্য করবে।

বিলটিকে সিলেক্ট কমিটিতে পাঠানো হয়নি। কারণ, পক্ষে ভোট পড়েছে ১১৭টি এবং বিপক্ষে ভোট পড়েছে ৭৫টি।

উল্লেখ করা যেতে পারে, তথ্যের অধিকার (সংশোধন) বিল ২০১৯ গত ২২ জুলাই লোকসভায় পাশ হয়। উদ্দেশ্য, মুখ্য তথ্য কমিশনার ও তথ্য কমিশনার-সহ রাজ্যগুলির মুখ্য তথ্য কমিশনার ও তথ্য কমিশনারদের কার্যকালের মেয়াদ, বেতন, ভাতা ও অন্যান্য বিচার্য বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।

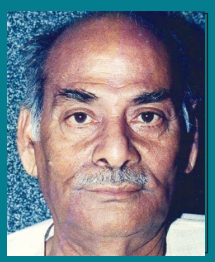
জাতীয় যুদ্ধ স্মারকে শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানালেন রাজনাথ



নিজস্ব প্রতিনিধি॥ প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিংহ কার্গিল বিজয় দিবসের ২০তম বার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে নতুন দিল্লিতে জাতীয় যুদ্ধ স্মারকে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান। জাতীয় যুদ্ধ স্মারকে ভিজিটার্স বুকে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী লেখেন 'ভারতের সম্মান, মর্যাদা ও গর্বের জন্য কার্গিল যুদ্ধে যাঁরা জীবনদান করেছেন, সেইসব বীর সেনাদের শ্রদ্ধা জানাই। এই সেনানীদের বীরত্ব ও আত্মবলিদান প্রত্যেক ভারতবাসীর কাছে প্রেরণাদায়ক। কার্গিল বিজয় দিবসের ২০তম বার্ষিকীতে আমরা শপথ নিই যে, দেশের সম্মানে সর্বোচ্চ আত্মত্যাগকারী সৈনিকদের জাতি কখনও বিস্মৃত হবে না'।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত প্রতিরক্ষা প্রতিমন্ত্রী শ্রীপাদ যশো নায়েক, উপ-সেনাপ্রধান লে: জে: দেবরাজ আনবু, উপ-নৌসেনা প্রধান ভাইস অ্যাডমিরাল জি অশোক কুমার এবং উপ-বায়ুসেনা প্রধান এয়ার মার্শাল রাকেশ কুমার সিংহ জাতীয় যুদ্ধ স্মারকে 'অপারেশন বিজয়'-এর বীর সেনানীদের অদম্য সাহসিকতা, বীরত্ব ও আত্মত্যাগের প্রতি শ্রদ্ধা জানান।

লোকান্তরিত প্রবীণ স্বয়ংসেবক সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়



গত ২৬ জুলাই লোকান্তরিত হলেন বঙ্গপ্রদেশের প্রবীণ স্বয়ংসেবক, পূর্বতন প্রচারক এবং ভারতীয় জনতা পার্টির দু'দুবারের রাজ্য সভাপতি ৯৫ বছরের সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর জন্ম ১৯২৬ সালের ২৬ অক্টোবর দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার জয়নগরের পাশে মজিলপুর গ্রামে, মামার বাড়িতে। মূলত তাঁদের বাস কলকাতার দর্জিপাড়া এলাকায়। তাঁর বাবা বীরেন্দ্রকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় কলকাতার লয়েডস্ ব্যাঙ্কে চাকুরি করতেন। তাঁরা ৪ ভাই ও ২ বোন। সজল,সুকুমার, সুহৃদকুমার ও সমীরকুমার। চার ভাই-ই রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের স্বয়ংসেবক। ১৯৪২ সালে সুকুমারদা বর্ধমান জেলার মুক্তকেশী বিদ্যালয় থেকে ম্যাট্রিকুলেশন করেন। কলকাতার বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে স্নাতক হন। ছাত্রজীবনেই তিনি কলকাতার মানিকতলার তেলকলের মাঠের শাখায় স্বয়ংসেবক হন। বিদ্যাসাগর কলেজে ছাত্রাবস্থায় তিনি ৪২-এর ভারত ছাড় আন্দোলনে যোগ দেন। ইংরেজদের বিরুদ্ধে মিছিলে শামিল হলে ব্রিটিশ পুলিশের রাইফেলের আঘাতে তিনি জ্ঞান হরিয়েছিলেন। ডান চোখের ভ্রু'র উপরে আঘাতের সেই চিহ্নটি তিনি সারা জীবন বহন করেছেন।

১৯৪০ সালে পড়াশোনা শেষ করে তিনি সঙ্ঘের প্রচারকের জীবন গ্রহণ করেন। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের রাজশাহি জেলার চাপাই নবাবগঞ্জে সঙ্ঘকাজ বিস্তারের জন্য যান। ১৯৪৬ সালে সঙ্ঘের তৃতীয় বর্ষ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করার পর তিনি বর্ধমান জেলা প্রচারকের দায়িত্ব পান। সেই সময় গান্ধীহত্যার মিথ্যা অভিযোগে তাঁকে ছয় মাস কারাবাস করতে হয়। ১৯৬০ সালে তিনি দক্ষিণ কলকাতার প্রচারক হন। ৬২ সালে স্বস্তিকা পত্রিকার ম্যানেজারের দায়িত্ব যোগ্যতার সঙ্গে পালন করেন। ১৯৭৫ সালে ইন্দিরা গান্ধীর জরুরি অবস্থার প্রতিবাদে সত্যাগ্রহ করে কারাবরণ করেন। জরুরি অবস্থা উঠে গেলে তিনি ভারতীয় জনতা পার্টিতে যোগ দেন। দু-দু'বার রাজ্য সভাপতির পদে থেকে তিনি দলকে তিনি যোগ্য পথনির্দেশ করেন।

বঙ্গীয় শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সঙ্ঘের পূর্বতন রাজ্য সম্পাদক অরূপ সেনগুপ্ত গত ২৩ জুলাই পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৫ বছর। তিনি শিক্ষক আন্দোলনের পুরোধা হিসেবে বঙ্গীয় শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সঙ্ঘের একেবারে প্রথম দিকের কার্যকর্তা ছিলেন। ২০০৮ থেকে ২০১৮ পর্যন্ত তিনি দীর্ঘ দশ বছর রাজ্য সম্পাদকের দায়িত্ব অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে পালন করেছেন। তাঁর নেতৃত্বে রাজ্যব্যাপী সংগঠনের শ্রীবৃদ্ধি ঘটে। শ্রীসেনগুপ্তের ছাত্রজীবন ও কর্মক্ষেত্র ছিল কলকাতা শহর। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি বড়িষার শশীভূষণ জানা কল্যাণ বিদ্যাপীঠের বাংলাভাষার শিক্ষক ছিলেন। কর্মজীবনেই তিনি রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের স্বয়ংসেবক হন। তিনি আদর্শ শিক্ষক হিসেবে এলাকায় জনপ্রিয় ছিলেন। সংগঠনের পূর্বতন রাজ্য সভাপতি অবনীভূষণ মণ্ডল তাঁর প্রয়াণে শোকজ্ঞাপন করে বলেন, অরূপবাবুর প্রয়াণে শিক্ষক সঙ্ঘের একটি পর্বের অবসান ঘটল। বর্তমান রাজ্য সম্পাদক গৌরাঙ্গ দাস বলেন শিক্ষক আন্দেলনে অরূপবাবুর অভাব বোধ হলেও যে চারাগাছটিকে তিনি বৃক্ষের রূপ দান করেছেন তাকে মহীরুহে পরিণত করার সংকল্প গ্রহণই তাঁর প্রতি যথার্থ শ্রদ্ধাজ্ঞপন।

* * *

মালদা নগরের প্রবীণ স্বয়ংসেবক আনন্দমোহন তালুকদার গত ১৮ জুলাই পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮২ বছর। তিনি তাঁর সহধর্মিণী, ১ পুত্র, ১ কন্যা ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন। তিনি সঙ্ঘের, শিক্ষক সংগঠনের এবং বিজেপির নানান দায়িত্ব যোগ্যতার সঙ্গে পালন করেছেন। উল্লেখ্য, তিনি বঙ্গীয় শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সঙ্ঘের রাজ্য সহ সম্পাদক তথা মালদা জেলার সভাপতি উজ্জ্বল তালুকদারের পিতৃদেব।

* * *

দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাট নগরের একটি শাখার মুখ্যশিক্ষক সুব্রত কর্মকার কর্কটরোগে আক্রান্ত হয়ে দীর্ঘ রোগভোগের পর গত ১৬ জুলাই পরলোকগমন করেন। মত্যুকালে তাঁহর বয়স হয়েছিল ২১ বছর।

* * *

দক্ষিণপুর জেলার তপন খণ্ডের লস্করহাট শাখার স্বয়ংসেবক অধুনা বালুরঘাট নিবাসী তরুণ বর্মন কর্কটরোগে আক্রান্ত হয়ে দীর্ঘ রোগভোগের পর গত ১৯ জুলাই পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫০ বছর। তিনি তাঁর সহধর্মিণী, ১ কন্যা ও ১ পুত্র রেখে গেছেন।

* * *

মালদা জেলার পুরাতন মালদা নগরের সহ নগর কার্যবাহ সঞ্জয় পালের মাতৃদেবী সুলতা পাল গত ২১ জুলাই পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৫ বছর। তিনি ২ পুত্র, ২ কন্যা ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন।

* * *

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের তারকেশ্বর জেলার জাঙ্গিপাড়া শাখার প্রবীণ স্বয়ংসেবক জগবন্ধু সেন গত ৩ জুন পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৩ বছর। তিনি তাঁর সহধর্মিণী, ১ পুত্র, এক কন্যা ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন।

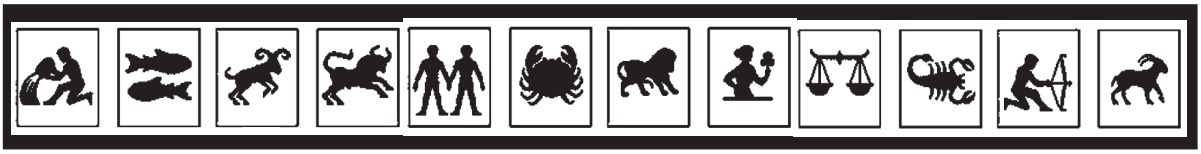
* * *

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের নব ব্যারাকপুর জেলার স্বয়ংসেবক তথা 'কর্মযোগী'র কার্যালয় প্রমুখ সুজিত চক্রবর্তীর মাতৃদেবী লক্ষ্মী চক্রবর্তী গত ১৮ জুলাই পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল ৬৫ বছর। তিনি ১ পুত্র,১ কন্যা ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন।

* * *

কলকাতা বেহালা শাখার প্রবীণ স্বয়ংসেবক তথা বেহালার সঙ্ঘকাজের স্থপতি স্বপন ঘোষের মাতৃদেবী বাসন্তীরানি ঘোষ গত ৮ জুলাই পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হযেছিল ৮২ বছর। তিনি ২ পুত্র, ৩ কন্যা ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন।

সা প্তা হি ক রা শি ফ ল



৫ আগস্ট (সোমবার) থেকে ১১ আগস্ট (রবিবার) ২০১৯। সপ্তাহের প্রারম্ভে মিথুনে রাহু, সিংহে রবি-বুধ, তুলায় শুক্র-বৃহস্পতি, ধনুতে বক্রী, মকরে মঙ্গল-কেতু। রাশি নক্ষত্র পরিক্রমায় চন্দ্র বৃষে রোহিণী থেকে সিংহে মঘা নক্ষত্রে।

মেষ : আইনজ্ঞ, গণিতজ্ঞ, প্রযুক্তিবিদদের ভাগ্যোদয় ও বিলাসী জীবন, শিল্পানুরাগীদের প্রেম-প্রীতি ও সৃজনশীলতায় স্বাচ্ছন্দ্য। ভ্রাতা-ভগ্নীর মেধার বিকাশ ও মর্যাদাপূর্ণ জীবন। বিদ্যার্থী ও সন্তান- সন্ততির জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও কারিগরি দক্ষতা বৃদ্ধি। মিত্র সমাগমে নিকট ভ্রমণ।

বৃষ : মাতার স্বাস্থ্যোন্নতি ও পরিবারের সদস্য বৃদ্ধির যোগ। আর্থিক শুভ বিলাস- ব্যসনে ব্যয় যোগ। যুবক-যুবতীর অশুভ দৃষ্টি শান্ত ও সংযতভাবে মোকাবিলা করুন। কর্মক্ষেত্রে আধিপত্য বজায় থাকবে। ভালো বন্ধু ভালো কাজের সহায়ক। হঠাৎ দূরদেশে ভ্রমণ। পিতা-পুত্রের সুকৃতি-সম্ভ্রম। পরিকল্পনার বাস্তবায়ন।

মিথুন : জ্ঞান, পাণ্ডিত্য, উৎকর্ষ, উৎফুল্লতায় ভরা মন। জগতের কর্মযজ্ঞে প্রতিভার পূর্ণ মূল্যায়ন ও মান্যতা, অগ্রজ ও চাকুরেদের পদোন্নতির সম্ভাবনা। গুরুজনের আশীর্বাদ লাভ। সপ্তাহের প্রান্তভাগে বিরোধিতা ও শরীরের কারণে উদ্বেগ। ক্যালকুলেটিভ আইডিয়ায় লিখিত কর্মে প্রসার ও শংসা।

কর্কট : গৃহের পরিবেশ ও মাতার স্বাস্থ্য হতাশার কারণ হবে। চিন্তাভাবনায় দোদুল্যমানতা পরিহার করুন। কর্মপ্রাপ্তি ও পেশাদারদের আধিপত্য বৃদ্ধি। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় সাফল্য, গুরুজনের সান্নিধ্যে সুপরামর্শ ও বৈষয়িক সমৃদ্ধি।

সিংহ : কোনো বন্ধুর পরামর্শ আর্থিক ক্ষতির কারণ। আয়ের একাধিক পথের সন্ধান। জমি-বাড়ির ক্রয়ের সম্ভাবনা। সন্তানের জ্ঞানার্জনে প্রতিভার উজ্জ্বল স্বাক্ষর যা গর্ব ও আনন্দ। প্রেম-প্রীতি- ভালবাসা ও স্বজন বাৎসল্যে সম্পৃক্ত মন। কৃষি ও কৃষকের প্রাপ্তি শুভ।

কন্যা : কর্মের যোগসূত্রে ভালো বন্ধুলাভ। প্রীতিকর, মেলবন্ধন, গৃহসুখ, উচ্চশিক্ষা অথবা কর্মসূত্রে স্থানান্তর, শৌখিন ও বিলাস দ্রব্যের ব্যবসায় নতুন বিনিয়োগ। সমাজ- প্রগতিমূলক কর্মে সুন্দর ও বর্ণময় জীবন। স্ত্রী অর্থ ও ভাগ্যোন্নতির সহায়ক।

তুলা : নিকটজনের মন্দ ব্যবহার মানসিক কষ্টের কারণ। পতি-পত্নী উভয়ের শরীরের যত্নের প্রয়োজন। চিন্তা করে সিদ্ধান্ত নিন। রিপ্রেজেন্টেটিভ ও যানবাহন ব্যবসায় আর্থিক শুভ। নীতিগত বিষয়ে অনেকাংশে সমঝোতা করে চলতে হবে। গৃহনির্মাণ, গৃহসংস্কারে ব্যয়াধিক্য যোগ।

বৃশ্চিক : লক্ষ্মী ও সরস্বতীর কৃপালাভ। কর্মক্ষেত্রে দক্ষতা, আধিপত্য, মান্যতা ও আর্থিক শুভ। সন্তানের জ্ঞানার্জনে সাফল্য। উচ্চশিক্ষায় আগ্রহ ও গুণীজনের সান্নিধ্য। সপ্তাহের প্রান্তভাগে উদার হৃদয়ে অন্ত্যজ শ্রেণীর সহায়তা। রমণীদের প্রতি দুর্বলতা ও মাথায় চোট-আঘাত বিষয়ে সতর্ক থাকা দরকার।

ধনু : পড়াশুনায় চাপের কারণে শারীরিক ও মানসিক অস্বস্তি। সততা, সরলতা, ভক্তি-শ্রদ্ধা, উদারতা, দৃঢ়তা, চিন্তার স্বচ্ছতা ও শাস্ত্রীয় জ্ঞানার্জনে সম্পৃক্ত মন। সাহিত্য পিপাসু ও শিল্প রসিকদের প্রতিভার উজ্জ্বল স্বাক্ষর ও মান্যতা। খনিজ, যানবাহন ও খাদ্যদ্রব্যের ব্যবসায় প্রাপ্তি শুভ।

মকর : ভ্রাতা, ভগ্নী ও প্রতিবেশীর নতুন কোনো খবর যা আনন্দ ও মর্যাদার। কর্মক্ষেত্রে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের বিরাগভাজন, মনকষ্ট। আয়-ব্যয়ের ভারসাম্য বজায় রাখা কঠিন। সন্তানের মানসিকতায় আধুনিকতার পরশ।

কুম্ভ : গহনা-গ্রহরত্ন, খনিজ ব্যবসায় নতুন বিনিয়োগে প্রাপ্তি। গৃহনির্মাণ, সংস্কার ও বিলাসব্যসনে আগ্রহ বৃদ্ধি। বেকারদের কর্মসংস্থানে প্রবাস। হস্তশিল্প, চর্মজাতদ্রব্যে অভিজ্ঞতার বাস্তব মূল্যায়ন। সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণে আইনি ব্যবস্থা নিতে হতে পারে। দেব-দ্বিজে ভক্তি বৃদ্ধি।

মীন : পরিজন সান্নিধ্যে গৃহে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে সমাজসেবায় হর্ষোৎফুল্ল চিত্তে যোগদান। গুরুজনের পরামর্শ অর্থাগমের ক্ষেত্রকে ত্বরান্বিত করবে। আদর্শগত ব্যাপারে সমঝোতা করাই শ্রেয়। সপ্তাহের অন্তভাগে বিরোধিতা ও সমালোচনার ঝড় পীড়াদায়ক হবে।

● ***জন্ম ছকের স্বাতন্ত্র্য ও দশা-অন্তর্দশা না জানায় কেবল গোচর ফল বর্ণিত হলো।***

—শ্রী আচার্য্য